শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্

Publication and Magazine Committee

Heramba Chandra College

কোরক

হেরম্বচন্দ্র কলেজ

বার্ষিক পত্রিকা

২০২৩

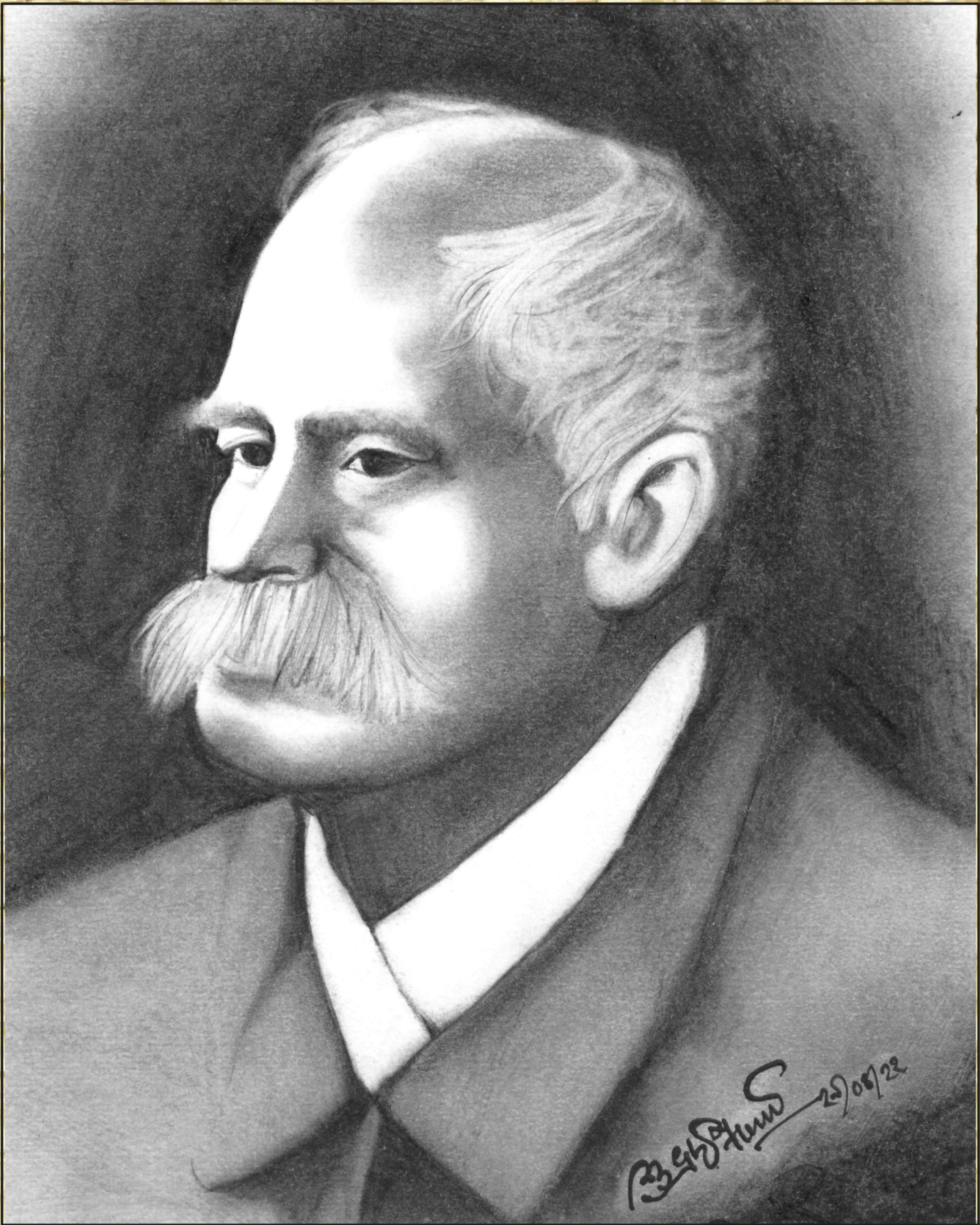

সুপ্রীতি বিশ্বাস, চতুর্থ অর্ধবর্ষ, বাণিজ্য বিভাগ

হেরম্বচন্দ্র কলেজ

কোরক

বার্ষিক পত্রিকা

২০২৩

উপদেষ্টা

ড. নবনীতা চক্রবর্তী

সম্পাদক

ড. ইমন বাগচী

সম্পাদকমণ্ডলী

ড. রক্তিম সুর

ড. মধুবন্তী সোম

ড. মহ. জিয়াউল হক

শ্রীমতী তপতী বেরা

পাবলিকেশন এন্ড ম্যাগাজিন কমিটি
হেরম্বচন্দ্র কলেজ

প্রকাশ

জুন, ২০২৩

প্রকাশক

ড. নবনীতা চক্রবর্তী

অধ্যক্ষ, হেরম্বচন্দ্র কলেজ

লোগো পরিকল্পনা

ড. অয়নাংশু সরকার

প্রচ্ছদ

শুভ্রদীপ ঢালি

ষষ্ঠ অর্ধবর্ষ, বাণিজ্য বিভাগ

মুদ্রণ

এস. কে. জি. মিডিয়া

২৪বি, শেক্সপিয়র সরণী

কলকাতা - ৭০০ ০১৭

দূরভাষ (০৩৩) ৪০৬৩ ৩৩১৮

সম্পাদকীয়

২০১৭ সালের পর ২০২৩ সাল। ছ' বছর পেরিয়ে আবার প্রকাশ পাচ্ছে কোরক। যতই বলি সময় আপেক্ষিক, তবু এই ছ' বছরে বিশ্ব পুরো ওলটপালট হয়ে গিয়েছে। শুধু আর্থ–সামাজিক পরিবর্তন নয়, মানুষের স্বভাব, জীবনযাত্রা– কিছুই আর পুরোপুরি আগের মতো নেই। থাকা সম্ভবও নয়। ২০২০ সালের পর যেন এক নতুন পৃথিবী গড়ে উঠেছে পুরনো পৃথিবীর মধ্যে থেকে।

এই নতুন পৃথিবীতে নতুন করে আত্মপ্রকাশ করছে এই পত্রিকা। আমাদের বিশ্বাস, কুঁড়ি থেকে যেভাবে ফুল ফোটে, ছ' বছর বাদে সেভাবেই ফুটে উঠবে কোরক। কারণ, এই পত্রিকার পাতায় পাতায় ছাত্রছাত্রীরা বুনে দিয়েছে নিজেদের সৃজনশীলতা। বছর পেরিয়ে যায়। রয়ে যায় তাদের বুড়ো আঙুলের ছাপ। পত্রিকার পাতা ওলটালে দেখা যাবে এখানে রয়েছে গল্প–কবিতা–ছবি–ফটোগ্রাফ। লেখা এবং ছবির ভালমন্দের চেয়েও যা বড়, তা হল ছেলেমেয়েদের মনের ছবি ধরা আছে পত্রিকায়। তবে এখানেই কিন্তু কোরক থামেনি। পাশাপাশি আছে কলেজের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের লেখাও। ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষাকর্মীদের যুগলবন্দির সার্থকতাই তো কোরক। সৃজনশীলতার সঙ্গে মিশে গিয়েছে মননশীলতা।

আগেই বলেছি, ২০২০ সালের পর বদলে গিয়েছে বিশ্ব। সেই বদল কি খুব সুখের? বোধ হয় না। এখনও যেন রোজকার জীবনে এক কালো ছায়া মাঝে মাঝেই দেখা যায়। তখন দমবন্ধ হয়ে আসে। অস্ফুটে নিজেকেই বলে ফেলি, আবার যদি...

তবু এমন পরিস্থিতিতে কোরক প্রকাশ করতে গিয়ে বারবার মনে হচ্ছিল, পরিস্থিতি যতই খারাপ হোক, তাতে মনের মালিন্য মেশেনি। বরং চারপাশের দমচাপা আবহাওয়ায় কোরক যেন এক মুক্তি। এক আনন্দ। এ যেন শ্মশানের বুকে ফুটে ওঠা গোলাপ।

কোরকের এই পথচলায় আমি কৃতজ্ঞ প্রতিটি শরিকের কাছে। কলেজের অধ্যক্ষ, শিক্ষক–শিক্ষিকা, অশিক্ষককর্মী, ছাত্রছাত্রী– সবাই। বিশেষ করে বলব, পাবলিকেশন অ্যান্ড ম্যাগাজিন কমিটির সদস্যদের কথা। তাঁদের উদ্যম এবং উৎসাহকে কুর্নিশ। তাঁদের জন্যই সমস্ত নেতিবাচক ভাবনাকে সরিয়ে এই পত্রিকা প্রকাশ সম্ভব হল।

শুভেচ্ছাবার্তা

হেরম্বচন্দ্র কলেজের বাৎসরিক পত্রিকা ‘কোরক’ প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দ বোধ করছি। করোনাকালে কোরক প্রকাশিত হতে পারেনি বলে একটা অপুর্ণতা ছিল। এবার আবার কলেজের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী অনেকেই স্বরচিত গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনি, ছবি, আলোকচিত্র প্রভৃতি দিয়ে পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করেছেন যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে উৎসাহব্যঞ্জক হবে বলে আমি মনে করি।

নিজের মনের কথা, ভাবনা ও সংগ্রহ অন্যের কাছে পোঁছে দেওয়ার মধ্যে যেমন আনন্দ আছে তেমনি তার মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয় পাঠক সমাজও। আশা করি, কলেজের ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রকাশিত এবারের ‘কোরক’–ও সকলের হৃদয় স্পর্শ করবে।

ধন্যবাদান্তে
বৈশ্বানর চ্যাটার্জী
সভাপতি, হেরম্বচন্দ্র কলেজ পরিচালন সমিতি

কলেজের কোরক-কথন

ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখার একটা আলাদা আনন্দ আছে। আর সে নাম যদি স্বরচিত কোনো রচনার সঙ্গে জ্বলজ্বল করে তাহলে তো একেবারে আহ্লাদে আটখানা। আমার লেখা পড়ছে আমার এক দুবছরের আগের বন্ধু বা পরের সেকি কম রোমাঞ্চ?

এই আনন্দের রূপদান করার বাসনায় কোরক, হেরম্বচন্দ্র কলেজের পত্রিকার উদগম হয়েছিল। মাঝে সে খানিক বিশ্রাম নিয়েছিল। তারপর পুণরায় ডালপালা মেলার আকাঙ্ক্ষায় একটু ছটফটানি শুরু হতেই ছেয়ে এল করোনা অতিমারীর করাল দংশন। অনেক শোক বেদনা সহ্য করে, অনেক ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে, অনেক অপূরণীয় ক্ষত নিয়ে আজ আবার একটা নতুন জীবনের স্রোত বাহিত হতে শুরু করেছে। সেই জীবনধারায় নতুন স্বপ্ন চোখে প্রকাশ পেতে চলেছে 'কোরক'। এখানে শুধু সাহিত্যচর্চা নয়, রয়েছে কলেজ সংক্রান্ত নানা তথ্যও। সেসব খবরাখবরে কলেজের ভিতরের বাইরের সব মানুষই বিবিধ জিজ্ঞাসার উত্তরের অনুসন্ধান পাবে মনে হয়।

এই পরিসর মূলত ছাত্রছাত্রীদের হলেও এগোনোর পথে হাত ধরেছেন কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরাও। বিচিত্র কাজের ফাঁকে, নানা বাধানিষেধের বেড়া লঙ্ঘন করে এই অসম্ভবকে সম্ভব করতে পেরেছেন যাঁরা তাঁদের সালাম। আমি স্থির নিশ্চিত কোরক আবার গতি পাবে, কলেজের সকলের হাতে হাতে সে পরিণত হয়ে উঠবে অচিরেই।

নবনীতা চক্রবর্তী

অধ্যক্ষ

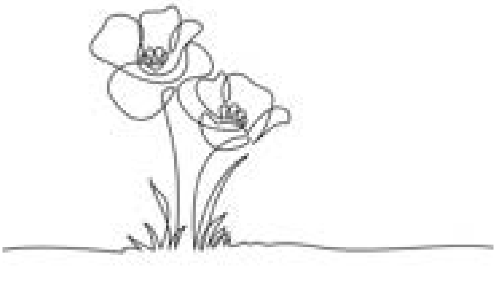

Welcoming the Return of 'Korak'

Any creative act of ours – even if laborious and painstaking – gives us joy and justifies our existence.

Higher education seeks avenues out of rote learning towards meaningful and constructive learning. It may materialize when students are given sufficient scopes for expressing their creativity within and without the curriculum. The college magazine is a trusted way of giving an opportunity to students as well as teachers to nourish their creative selves. Hence it gives me great happiness to congratulate the Publication and Magazine Committee of Heramba Chandra College for architecting this much-awaited comeback of 'Korak', our college magazine, with all-round participation from students, teachers and non-teaching staff. I welcome the return of 'Korak' after the pandemic times and wish for our beloved magazine a very long and glorious journey ahead.

Dr. Ranjan Kumar Audy
Coordinator, Internal Quality Assurance Cell

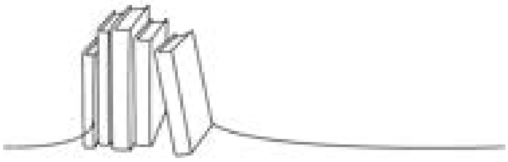

প্রতিকূলতা পেরিয়ে কোরক

কলেজ জীবনের অন্যতম আকর্ষণ কলেজ ম্যাগাজিনগুলো ক্রমশ তার গুরুত্ব হারাচ্ছে। মোবাইল ফোনের মতো ইলেকট্রনিক গ্যাজেটগুলো মানুষের অভ্যাস পালটে দিচ্ছে। তার ওপর রয়েছে অতিমারির প্রভাব। এই অবস্থার মধ্যে আমাদের কলেজের ঐতিহ্যবাহী ম্যাগাজিন 'কোরক' সাড়ম্বরে প্রকাশিত হতে চলেছে। পত্রিকার লেখক–লেখিকা ও পাঠকদের জন্য রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। 'কোরক'–এর সাফল্য ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

সুব্রত মণ্ডল
প্রধান করণিক

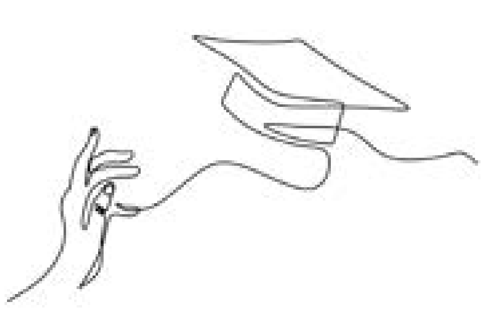

হেরম্বচন্দ্র কলেজ

কোরক

বার্ষিক পত্রিকা

২০২৩

সূচিপত্র

ইন্দ্রাণী মিত্র	ফিরে দেখা	১১
বিপুল মণ্ডল	সমাজ	১৪
সৌরিক দাস	একটি স্টেশনের আত্মকথা	১৪
শীর্ষেন্দু রায়	আত্মবিশ্বাস	১৪
উদয়ন সেনগুপ্ত	সূর্য ও রাতের কথা	১৫
তিষা গড়াই	পরিসমাপ্তি	১৫
নিরূপম দাস	চল ছুটে যাই	১৬
অনির্বাণ চক্রবর্তী	মালঞ্চ	১৬
অচিন্ত্য মণ্ডল	রামানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ	১৭
Krishna Sen	**The Game of Life**	২১
Sukanta Saha	**How Can I Tell You**	২১
শুভায়ন মিত্র	মহামারীর থাবা	২২
রেশমী মিত্র	বিদ্যাসাগর ও আমাদের মিত্রবংশ: একটি সত্য ঘটনা	২৪
প্রিয়াঙ্কা গুপ্ত	বর্তমান পৃথিবী	২৬
Ranjan Kumar Auddy	**Truthfulness**	২৭
মেঘা সিং	আমার কাছে স্বাধীনতার অর্থ	২৯
আর্যবীর পোদ্দার	যে সব রাতে স্বপ্ন আসে না	৩০
সবিতা মণ্ডল	নদীয়ার লোকসংস্কৃতি	৩১
অন্বেষা রায়	বৃষ্টি	৩৪
Anushka Bardhan	**Beauty of a Normal Life**	৩৫

Lily Law	**Ghost Rider**	৩৬
Bodhisattwa Bardhan Choudhury	**Beyond GDP Exploring Bhutan's Gross National Happiness Index**	৫৩
Paromita Dutta	**Financial Inclusion of Self-Help Group (SHG) Members with Special Emphasis on People with Disabilities**	৫৬
Trambak Bhattacharya	**Treading Lightly in the Abode of the Thunder Dragon**	৫৯
মধুবন্তী সোম	প্রবাসী সাহিত্যিক জ্যোতির্ময়ী দেবীর ছোটোগল্পে অন্য রাজস্থান	৬২
Nageswar Singh	**Hey Oldie...**	৬৮
Shreyam Sen	**Indian Films at the Oscars: A String of Cursory Takes**	৬৯
সন্তু মুখোপাধ্যায়	মন, মস্তিষ্ক আর ইত্যাদি...	৭৪
Krishnanshuk Saha	**The City of Lights: Varanasi**	৭৫
Soumi Hazra	**Defence Mechanism**	৭৮
Suravi Kar Roy	**The She-Cession in the Covid Era**	৮১
Esha Kumari Shaw	**What Does Freedom Mean to You**	৮৬
সোমনাথ হালদার	মহামারী	৮৭
সাদ্দাম হোসেন মণ্ডল	করোনাকালে তাঁতিপাড়া	৮৮
পার্থিব সূত্রধর	আত্মহত্যা	৯০
আনোয়ার হোসেন	আর্তের সেবায় সেন্ট জন অ্যাম্বুল্যান্স	৯৪
Samhati Soor	**Why Will I Study Library and Information Science?**	৯৬

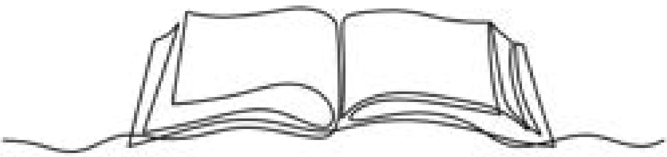

ফিরে দেখা

ইন্দ্রাণী মিত্র

আজও সেই দিনের কথা মনের মধ্যে টাটকা রয়ে গেছে। সাঁইত্রিশ বছর আগে ডিসেম্বর মাসে যেদিন এই কলেজ প্রাঙ্গণে প্রথম পা রেখেছিলাম ইন্টারভিউ দিতে। তখন কলেজ সার্ভিস কমিশন ব্রাহ্ম কলেজে তিনজন করে পাঠাত, কলেজ তরফে আর একটা ইন্টারভিউ এর জন্য। অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ন হয়ে কলেজে যোগ দিলাম ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৮৬। তখন হেরম্ব চন্দ্র কলেজ ছিল ছেলেদের কলেজ। শুধু কলেজ নয়, স্টাফ রুমও ছিল পুরুষ অধ্যুষিত।

আমি সেখানে দ্বিতীয় মহিলা। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার হাতে পাবার পর শুরু হল বাড়িতে জল্পনা। ছেলেরা কিন্তু পেছনের বেঞ্চ থেকে কুকুর ডাক, বেড়াল ডাক দেবে, সামলাতে পারবি তো? জল্পনা যাই হোক, কলকাতার বুকে কলেজে চাকরি পেয়েছি, ছাড়ার কোন প্রশ্ন নেই। প্রথমদিন দুরু দুরু বুকে কলেজ বিল্ডিং এ ঢুকলাম। সোজা স্টাফ রুম, গত সপ্তাহে যাঁদের ইন্টারভিউতে দেখেছি, তাঁদের দেখতে পেলাম না। নিজেই নিজের পরিচয় দিলাম। অধ্যাপক অশোক মুখোপাধ্যায় বসে ছিলেন, তাঁর পাশে বসলাম। কিন্তু কি করণীয় জানি না। এমন সময় অনেকে ঢুকলেন, তাদের মধ্যে ছিলেন অর্থনীতির তৎকালীন প্রধাণ, তিনি আমাকে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। হাতে রেজিস্টার ধরিয়ে বললেন, ইন্ডিয়ান ইকনমিক্সের ওপর ক্লাস নিতে। যাবার আগে রেজিস্টার কিভাবে লিখতে হয় দেখে নিতে বললেন। আমি একপাতা লিখে বন্ধ করছি দেখে প্রফেসর মুখোপাধ্যায় বললেন, এটা প্রেসিডেন্সী কলেজ নয়। এক একটি ক্লাসে দেড়শ স্টুডেন্ট আছে। সাত আট পাতা জুড়ে নাম লেখা থাকে প্রতি ক্লাসের রেজিস্টারে। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করেই ফেললাম, ছেলেরা কি খুব গোলমাল করে? না না সবাই ক্লাসে থাকে না। যারা ক্লাসে থাকে তারা গোলমাল করে না। ভয়ে ভয়ে ক্লাসে গিয়ে ভারতীয় অর্থনীতি নিয়ে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে যখন ফিরলাম, মনে হল তেমন ভয়ের কিছু নয়।

এবার আসি স্টাফরুমের কথায়। আগেই বলেছি স্টাফ রুমে আমি দ্বিতীয় মহিলা। অনেক পুরুষ অধ্যাপক, কিন্তু তাঁরা মহিলাদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া বলেন না, আড্ডা তো দুরস্থান। একমাত্র ব্যতিক্রমী মানুষ ছিলেন অধ্যাপক সলিল বিশ্বাস। তিনি অত্যন্ত সহজভাবে মহিলাদের সঙ্গে মিশতেন। তাঁর যোগ্য দোসর ছিলেন অধ্যাপক রজত ভট্টাচার্য। তাঁর কাছে তৈলাক্ত বাঁশ আর বাঁদরের অঙ্ক নিয়ে হয়রানি আর সেই সঙ্গে সাড়ে তিনটি বাঁদর উত্তর পাওয়ায় তাঁর লাঞ্ছনা আমাদের ছিল পরম উপভোগের ব্যাপার। আস্তে আস্তে মহিলার সংখ্যা বাড়তে লাগল। এখন তো কলা আর বিজ্ঞান বিভাগে মহিলাদেরই আধিপত্য।

আমার কলেজে যোগ দেবার সময় আর একটা ঘটনা ঘটেছিল। অধ্যক্ষ সুবোধবাবুর সঙ্গে শিক্ষকদের আর ছাত্র পরিষদের বিরোধ বেধেছিল। প্রথমদিন যত না ক্লাস নিতে ভয় করেছিল, তার থেকে বেশি ভয় করেছিল ছাত্রনেতার কাছে অধ্যক্ষকে লাঞ্ছিত হতে দেখে।

কিছুদিন পরেই শিক্ষকেরা অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে স্টাফ রুমের চেয়ার ছেড়ে এখন যেখানে সিকিউরিটি স্টাফেরা বসে, সেখানে শতরঞ্চি পেতে বসে সেখান থেকে ক্লাসে ক্লাসে গিয়ে ক্লাস নেওয়া শুরু করলেন। প্রতিবাদের নতুন ধরণ ভালই লেগেছিল। এ অচলাবস্থা কবে কেটেছিল মনে পড়ে না, তবে অধ্যক্ষের সঙ্গে দ্বৈরথ অনেকদিন চলছিল। এমন সময় প্রখ্যাত সেতারবাদক সুব্রত রায়চৌধুরী, যার জায়গায় আমাকে কলেজ সার্ভিস কমিশন থেকে পাঠিয়েছিলেন, তিনি পদত্যাগ করলেন। তখন অধ্যক্ষ বিদায়ের পথে, আমার

কার্যকালের সময়সীমা অতিক্রান্ত। কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ আমার সময়সীমা না বাড়ালে ব্রেক অফ সার্ভিস হয়ে যাবে। সেই মুহূর্তে কোন স্বীকৃত কলেজ কর্তৃপক্ষ ছিল না। আমার তো তখন স্টাফ রুমের কারো সঙ্গেই তেমন ঘনিষ্ঠতা নেই, যাতে এ ব্যাপারে কাউকে কোন অনুরোধ করতে পারি। সলিলদা কাউকে কিছু বলেছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু বেশ কিছু উদ্যমী মানুষ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কোর্টের মাধ্যমে আমার সময়সীমা বাড়িয়েছিলেন। পরে স্থিতাবস্থা ফিরলে আমার চাকরি পার্মানেন্ট হয়ে ঘায়। আমি কলেজের স্থায়ী সদস্য হয়ে যাই।

আগেই বলেছি, স্টাফ রুমে মহিলার সংখ্যা বাড়ছিল, তবে মহিলারা স্টাফ রুমে তেমন জাঁকিয়ে বসতে পারেনি। মুল আড্ডা বা বিতর্কে তারা যোগদান করত না। দুই নদী মিলল যখন নবনীতা যোগ দিল। ওর ছিল দুটো বিষয়ে পি এইচ ডি, একটা বাংলায় আর একা আড্ডায়। তখন কলেজ সার্ভিস কমিশনের সুবাদে বেশ কিছু তরুণ প্রজন্মের লোকের স্টাফ রুমে জায়গা হয়েছে। তাদের মহিলাদের সঙ্গে আড্ডা দেবার সহজ প্রবণতা আছে। কিন্তু স্টাফ রুমের অলিখিত নিষেধের বেড়াজাল টপকাতে পারেনি মহিলাদের মনোভাব অজানা থাকার জন্য। নবনীতার উদ্যোগে একটি মিশ্র দল তৈরী হল। আগে শুধু ছেলেরা আড্ডা মারত। হেরম্বচন্দ্র কলেজের আড্ডার এমনই খ্যাতি ছিল যে অনেকে অন্য কলেজে চাকরি করেও এই কলেজে আংশিক সময়ের জন্য পড়াতেন, আড্ডার লোভে। এবার মহিলারা সেই আড্ডায় জুটলেন। কিছু ভ্রূকুঞ্চিত হল। সলিলদা হলেন সেই মিশ্র দলের অবিসংবাদিত নেতা। তিনি তার আগেই যোজনগন্ধা ইত্যাদি রেস্টুরেন্টে খেয়ে পেটের বারোটা বাজিয়ে ফেলেছেন, কিন্তু কোন রেস্টুরেন্টে কি ভাল পাওয়া যায়, সে তার নখদর্পণে। আমি পড়লাম মহা বিপদে। আড্ডার অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ। আড্ডা বসত ক্লাস শেষে, ক্লাসের ফাঁকে আড্ডা দিতে পারলেও ক্লাসের শেষে বেশি পারতাম না, হাওড়া ফিরতে হবে, বাড়িতে ফিরতে হবে, ছেলে ছোট। নবনীতার ছেলে মেয়ে আরও ছোট, কিন্তু তারা ছিল মাসীমার সেফ কাস্টডিতে, কলেজ থেকে দশ মিনিটের দূরত্ব। বাকি সব দক্ষিণ কলকাতার। সলিলদা, শর্মা দূরে, তাদের বাড়িফেরার কোন তাড়া ছিল না। আড্ডার জেরে, বন্ধুত্বের জেরে কখন যে কলেজটা দ্বিতীয় বাড়ি হয়ে গেছিল, তা খেয়াল করিনি।

আমরা যখন কলেজে যোগ দিই, তখন এটা ছিল প্রধাণতঃ কমার্স কলেজ, সেইসঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞান আর ইতিহাসের সাম্মানিক কোর্স ছিল। আর কোন বিষয় ছিল না। বন্ধুবান্ধব দের সঙ্গে রিইউনিয়নে দেখা হলে তারা যখন ইকনমিকস অনার্সের বিভিন্ন পেপার নিয়ে আলোচনা করত, তখন অনার্স পেপার পড়াবার ইচ্ছে হত। কমার্সে বাঁধাগতে ইকনমিক্সের পড়া পড়াতে পড়াতে একটু আফশোষ হত। কিন্তু কি করা! যৌথ পরিবারের দায়িত্ব সামলে, বাচ্চা সামলে কলেজে আসতেই দম ফুরিয়ে আসত। তারপরে অনার্স কোর্স খোলার দায়িত্ব নেওয়া প্রশ্নের বাইরে। স্টাফ রুম তখন তারুণ্যের তাপে টগবগ করছে। বিশেষতঃ অমিত দাশগুপ্তের উদ্যোগে প্রশান্ত শর্মা, নবনীতা, বুদ্ধ, আর চিরতরুণ সলিলদা লেগে পড়লেন অনার্স খুলতে। বছর দুয়েকের মধ্যে ইংলিশ, ভূগোল, বাংলা, ইকনমিকস, শিক্ষায় (এডুকেশন) অনার্স খোলা হল। আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এর আগেই নেওয়া হয়েছিল, মেয়েদের ছাত্র হিসেবে অন্তর্ভুক্তি। প্রতিদন্দ্বিতা বাড়াতে এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে কলেজের গুণ গত মান বাড়িয়েছিল।

ছোট ছোট ডিপার্টমেন্ট। ছাত্রসংখ্যা কম। মাস্টারমশাইদের সঙ্গে সহজেই বন্ধুত্ব তৈরী হয়ে গেল। শুরু হয়ে গেল কয়েকটা ডিপার্টমেন্ট মিলে এক্সকারশন, পিকনিক। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক বেশ দৃঢ় হল। এর আগেও কলেজ এক্সকারশন হত। কিন্তু সেটা হত ছাত্র ইউনিয়নের তত্বাবধানে, দু একজন ইয়ং টিচার যেতেন। মহিলাদের যাওয়ার কোন প্রশ্ন ছিল না। এখন মেয়েরা থাকাতে মহিলাশিক্ষকদের যাওয়া আবশ্যিক হল।

ক্লাসে কম ছাত্র সংখ্যা শুধু যে ছাত্র-শিক্ষক সৌহাদ্য বাড়ায় তাই নয়, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের বুনিয়াদ মজবুত করে। আমার অবশ্য এই নৈকট্য আসতে যথেষ্ট দেরি হয়েছে।

শুরুতেই বাড়ির সাবধান বাণী ‘‘সামলাতে পারবি তো’’ একটা সুদুর প্রসারী প্রভাব ফেলেছিল। আমি ক্লাসে কোন হাসির কথা বলতাম না। ক্লাস শুরু থেকে শেষ অবধি কেবল ইকনমিকস। প্রথমদিকে মহিলা দেখে ছাত্রদের একটু বাজিয়ে দেখার ইচ্ছে হওয়া স্বাভাবিক। ছুটকো কমেন্ট একেবারে শুনিনি এমন নয়। কে বলেছে ধরতে পারতাম না। আমার অস্ত্র ছিল ইকনমিকস। কোন বেঞ্চ থেকে আওয়াজ এসেছে ধরতে পারতাম। একেবারে বেঞ্চ ধরে ইকনমিকসের পড়া ধরা। তখনকার কমার্সের অধিকাংশ ছাত্রের কাছে অর্থনীতি আর অংক

ছিল যম। অবধারিতভাবে পড়া পারত না, ক্লাস থেকে বের করে দিতাম। ইউনিভারসিটির পরীক্ষাতেও কড়া গার্ড দিতাম। এভাবে কখন যে এক ত্রাসের ভাবমূর্তি তৈরী করেছি বুঝতে পারিনি। একদিন বাসে করে কলেজে আসছি, একটি মেয়ে দেশপ্রিয় পার্ক থেকে বাসে উঠে আমার পাশে বসল।

বসেই বলল, আপনি আই এম ম্যাম? কমার্সে এত ছাত্র! উপস্থিতির কড়াকড়ি ছিল না। তাই রোজ ক্লাসে ছাত্র কম্পোজিশন পালটে যেত। কারো মুখ মনে রাখতে পারতাম না। আই এম ম্যাম এই অভিধা শুনে বুঝলাম হেরম্বচন্দ্রের ছাত্রী। বলল, বন্ধুদের কাছে শুনেছে আই এম ম্যাম ভীষণ রাগী, কথা বলা যায় না। ও বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ধরেছে আমার সঙ্গে কথা বলবে। তাই কথা বলছে। মনে হল হো হো করে হাসি। বাসের লোক পাগল বলবে ভেবে আত্মসংবরণ করলাম।

ছোট নিজ ডিপার্টমেন্ট খোলার পর ভাবলাম এই ত্রুটি শোধরাই। ছাত্রদের সঙ্গে একটু সহজভাবে মিশি। এ সংকল্পসে প্রধান অন্তরায় আমার বয়স আর টিউটোরিয়াল নামক একটি ক্লাস বা পরীক্ষা। কাঁচাপাকা চুল, বড় টিপ, তদুপরি না-হাসা, মধ্যবয়সী (১৯৯৯এ অনার্স খোলার সময়) আমি ছাত্রছাত্রীদের তুলনায় অনেটাই বড়। তারপরে আবার বকুনি দেওয়া ম্যাডাম।

ছাত্ররা বিশেষ কাছে ঘেঁষত না। তারপর নিজেরাই শুরু করলাম টিউটোরিয়াল ক্লাস, ধারণা স্বচ্ছ করার ক্লাস। ইকনমিক্স ছোট ক্লাস, ভয়ে না ভক্তিতে জানিনা ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস করত। কিন্তু তা বলে দৈনন্দিন পড়াশুনা? নৈব নৈব চ। তাই টিউটোরিয়াল ক্লাস হয়ে গেল ছাত্রদের কাছে বিভীষিকা। এরপরে আবার সি.বি.সি.এস. এসে টিউটোরিয়ালের ওপর পরীক্ষা শুরু হল। প্রথম বছর আমি ওদের ক্লাস নিতাম না। সুবীর চলে যেতে টিউটোরিয়াল পরীক্ষা নেবার ভার পড়ল আমার ওপর। গিয়ে শুধু বসেছি, প্রথম ছেলেটি এসে চাহিদা রেখা সম্পর্কে বলল, চাহিদা রেখা ভোক্তার আয় সম্পর্কে ধরলে উর্ধমুখী হয়। পিলে চমকানো জ্ঞান। এই বিপর্যয়ের পেছনে পুরোনো ছাত্রছাত্রীদের অবদান আছে। আই এম ম্যামের বিভীষিকার এমন বিষদ বিবরণ তাদের দেওয়া হয়েছে যে সবাই কেঁপে কেটে একসা।

এর কিঞ্চিৎ সমাধান হল এক্সকারশনে গিয়ে। খুব যে সচেতন পদক্ষেপ তা বলা যাবে না। একটা সময় দেখা গেল আমি ছাড়া ডিপার্টমেন্টে কেউ এক্সকারশনে নিয়ে যাওয়ার নেই। ম্যাথস ডিপার্টমেন্টের দুজনকে নিয়ে এক্সকারশনে গেলাম। পরপর দু বছর। এখন ডিপার্টমেন্টে ওনেক নতুন তাজা মুখ এসেছে, তারা এখন দূরে দূরে পাড়ি দিচ্ছে। প্রৌঢ় বয়সে এসে বুঝেছি ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক বা ছাত্রদের মধ্যে সম্পর্কের জন্য এক্সকারশন খুব জরুরী।

আজ বিদায়বেলায় ছাত্র ছাত্রীদের কাছে উষ্ণ বিদায় সম্বর্ধনা পেয়ে মনে হচ্ছে দুরত্ব হয়তো কিছুটা কমিয়ে ফেলতে পেরেছি। ছোটবেলা থেকেই যে কাজ করেছি, তাতে একশ শতাংশ দেবার চেষ্টা করেছি। ভাল মানুষ, ভাল শিক্ষক হবার চেষ্টা করেছি। কতটা পেরেছি তা আমার সহকর্মী আর ছাত্ররাই বলতে পারবে। শুধু বলতে পারি যে আমার চেষ্টায় কোন খাদ ছিল না।

সাঁইত্রিশ বছরের কর্মজীবনে কোন ভুল বোঝাবুঝি হয়নি, কোন দুঃখ পাইনি, কোনদিন অপমান বোধ করিনি এমন কথা বলা যাবে না। কিন্তু তার তুলনায় প্রাপ্তি অনেক বেশি।

কলেজ যে আমার জীবনে কতখানি জায়গা নিয়েছে, কলেজে থাকতে তা বুঝতে পারিনি।

কলেজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে বুঝতে পারছি কলেজ, তার বাড়ি, তার মানুষজন এক অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে আমায় টানছে।

সৌজন্যে নিশান অধিকারী, চতুর্থ অর্ধবর্ষ, বাণিজ্য বিভাগ

প্রাক্তন সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ

সমাজ

বিপুল মণ্ডল

লোহার খাঁচায় বন্দি থেকে
বাহবা কাকে দাও?
সবাই যদি সফল হয়,
কে চালাবে নাও?
চিৎকার তোমার অর্থহীন
বাড়ুক যতই দিনদিন।
মাঝির ছেলে মাঝিই হবে
ঝি এর মেয়ে ঝি
দেশ সবার উন্নতিতে
আমার তাতে কি?
আমরা আছি বেশ সুখে
কষ্ট কোনো নেই বুকে
জানি, শিক্ষাতে সব পরিপাটি
শত শত হাজার কোটি
কি দারুন সব বর্ম,
হাত পা সব গুটিয়ে
নেই কোনো কর্ম।
মা বোনেদের কথা থাক
তারা এখন শান্তি পাক।
গোটা কয়েক ছানা পোনা
অভুক্ত মাতৃকোলে
ঘুমিয়ে তারা খিদে ভোলে।
দিন বিরাতে অশ্রু ঝরে
কজন বাঁচে? কজন মরে?
রাখো কি তার খবর?
দিন শেষে বাটি হাতে
তিনজনাতে একপাতে,
নেই কোনো কষ্ট
শতকষ্ট থাকলেও
দেশটি আমার শ্রেষ্ঠ।

চতুর্থ অর্ধবর্ষ, বাণিজ্য বিভাগ

একটি স্টেশনের আত্মকথা

সৌরিক দাস

অসীম দিগন্তরেখায় ছুঁয়ে যাওয়া,
কিংবা শব্দের আভাস খুঁজে পাওয়া-
নিসর্গের মাঝে বেঁচে থাকা,
চক্ষুদ্বয়ের শান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে দেখা।
ঘড়ির কাঁটার অবিরত স্থান,
থেমে থাকে না কখনও স্টেশন।
একটির পর একটি ট্রেন আসে আর যায়,
সাথে সাথেই জনসমাগমও বদলায়।
রয়ে যায় স্মৃতি
ক্রমশ পাল্টাতে থাকে একটি স্টেশনের আত্মকথার ইতি।

ষষ্ঠ অর্ধবর্ষ, বাংলা বিভাগ

আত্মবিশ্বাস

শীর্ষেন্দু রায়

বাইরে একবার চেয়ে দেখো
আশেপাশে কেউ নেই সাহায্য করার
তাই আত্মনির্ভরশীল হতে শেখো
দেখবে ঈশ্বর সদয় আছে তোমার

অহংকার বড়ো খারাপ জিনিস
তাহলে ভাগ্য তোমায় দেবে ফাঁকি
আরে চাঁদ সূর্যেরও গ্রহণ লাগে
তাহলে আমরা মানুষদের অকাতটাই বা কি

জীবনে বহুবার প্রতারিত হবে
কারণ চারিদিকে যে বিশ্বাসঘাতক রয়
তবু নির্ভীক হয়ে এগিয়ে চলো
দেখবে শেষে তোমারই হবে জয়

ধৈর্য্য, ভরসা, সাহস রাখো
বুদ্ধি রেখো মগজে
তাই যতই বাধা দুঃখ আসুক
হার মানবে না অতি সহজে।

চতুর্থ অর্ধবর্ষ, বাণিজ্য বিভাগ

সূর্য ও রাতের কথা

উদয়ন সেনগুপ্ত

সূর্য উঠল দিনের আলোয়,
জগত উঠল হেসে
ধানক্ষেতে আর পাখির মন
খুশির সুর ভাসে।

রাতে মনটি উদাস হলে
আমায় নিয়ে কেউ কি ভাবে?
নিদ্রামগ্ন চক্ষু নিয়ে কেইবা
হাসে রাত্রি জেগে?

উদ্যমেতে সুপ্রভাতে
তুমি নতুন জীবন গড়ো,
রাতের আঁধার ঘনিয়ে এলে,
শ্রান্ত তুমি এসে পড়ো।

সন্ধ্যা এসে বলল, হেসে
ওহে বন্ধু কলহ কেন?
আমরা তো আসলে এক
একে তো অপরের তরে।

শিক্ষাকর্মী

পরিসমাপ্তি

তিষা গড়াই

১৬ মার্চ
(১ চৈত্র)
চৈত্রের শুরু। কম্বলটা তখনও হালকা গায়ে দিতে লাগছে মাঝে মাঝে। জোগাড় ক্রিয়া এখন থেকেই শুরু হয়ে গেছে। কালকে বড়ো মাসি, ছোটো পিসি আর দিদি-দাদারা আসবে। পরশুদিন পূর্ণিমার পুজো। দোল পূর্ণিমা। ঘুম চোখ খোলার পর থেকে প্রায় সাত বার বাজারে যেতে হয়েছে। ফুল, মালা, মিষ্টি, সবজি, ফল থেকে দশকর্মা; সব সামলাতে হয়েছে কাকার সাথে।

১৭ মার্চ
(২ চৈত্র)
এক পেট লুচি, ছোলার ডাল, আলুর দম, মিষ্টি খাওয়ার পর মাঝ রাতে জল তেষ্টা পেলে শুধু কি আর জল পান করা যায়! অগত্যা ফ্রিজ খুলে দু'চামচ মিহিদানা মুখে পুরে আবার মশারির ভিতর ঢুকলাম। আজ আমার ঠাঁই তিনতলায় ঠাম্মার পাশের ঘরে, বুকু দাদা আর রিল্টি দাদার সাথে। আমার ঘরটাতে গুনগুন, রঞ্জা-দি, মেঘা-দি আর রঞ্জা-দির বান্ধবী পর্ণশ্রী-দি শুয়েছে।

১৮ মার্চ
(৩ চৈত্র)
আমার বরাবরই রাতে ঘুমানোর আগে ডায়েরি লেখা স্বভাব। সারাদিনের ঘটনা সংক্ষেপে লিখে রাখি। আজ গল্প-আড্ডার সাথে সাথে পুজোর জন্য ফুল, আলো দিয়ে বাড়ি সাজিয়ে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ি, তাই কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম খেয়াল নেই। এখন মধ্যরাত। সাড়ে তিনটে বাজে। সারা-বাড়ি ঘুমন্তপুরীতে তলিয়ে গেছে। কাল ভোরবেলা উঠতে হবে, খুব মজা হবে। পুজোর পর সবাই মিলে রং খেলব যে...

চতুর্থ অর্ধবর্ষ, বাণিজ্য বিভাগ

চল ছুটে যাই

নিরূপম দাস

চল ছুটে যাই পাঠশালাতে
নতুন জীবন পাঠে,
শৈশবে যে মাখবে ধুলো
সবুজ ঘাসের মাঠে।

চল ছুটে যাই দূর পাহাড়ে
গুনবো রাতের তারা,
শৈশব আজ হারিয়ে গেছে
নেই কোনো তার সাড়া।

চল ছুটে যাই নদীর পাড়ে
দেখব জলের ঢেউ,
ভাসাবো কাগজের নৌকা
মানব না তো কেউ।
চল ছুটে যাই নীল দিগন্তে
উড়ছে পাখি ঝাঁকে ঝাঁকে,
সুর মিলিয়ে বইছে নদী
জীবনেরই বাঁকে বাঁকে।

চল ছুটে যাই কল্পনাতে
রূপকথার ওই দেশে,
যেথায় শুধু হাসবে জীবন
কঠিন বাধার শেষে।

চল ছুটে যাই দূর সমুদ্রে
ডাকছে উত্তালমন,
ভাঙবে বেড়া সব সীমানার
না চাই মুক্তিপণ।

চল ছুটে যাই রণ থামাতে
শান্তি বাণীরূপে,
সাজাব আবার রঙীন জীবন
এই ধরণীর বুকে।

সরকার পোষিত কলেজ শিক্ষক, বাণিজ্য বিভাগ

মালঞ্চ

অনির্বাণ চক্রবর্তী

ব্যাবসা করব ঠিক করেছি,
খুলব একখান মালঞ্চ!
যেখানে থাকবে, দোলনচাঁপার মরসুমী অন্তমিল,
থাকবে শিউলী ফুলের ঘাণ;
কৃষ্ণচূড়ার দুর্মূল্য প্রয়োগ,
কাঠগোলাপের স্নিগ্ধতা গোলাপের খুনসুটি প্রেম,
ও সূর্যমুখীর বিস্তর... অভিমান!

আমি অপূর্ণ এক কাঙ্খিত মন...
তবু আকাশ হয়ে স্বপ্ন বলবো/বাতাস হয়ে কাব্য,
ওদের প্রেমের পূর্ণতাতেই,আমি খুশি থাকব!
এই করেই বিলিয়ে দেবো, বিলীন হবো,
বয়ে যাবে তাদের মধ্যে
আমার গড়া, সেই একখান মালঞ্চ।

লেখক বর্গ, লাগলে বলো...
ছড়িয়ে দেব বক্ষ মাঝের উঠান জুড়ে,
সবাই সবার হিসাব বুঝে মানিয়ে নিও,
প্রয়োগ কর ইচ্ছে মতো অন্তরীনি কথায়,
ব্যাস বাকিটা তোমার কাজ।

যদিও আমি বলি কী...
ভাবছো যাকে, লিখছো যাকে,
যার নামেই বর্ণিত ওই অন্তঃকরণ!
দামাল মেঘে তার স্মরণেই,করে নিও বৃষ্টিবরণ,
আর উহ্য থাকুক স্মৃতিচারণ।

দ্বিতীয় অর্ধবর্ষ, বাণিজ্য বিভাগ

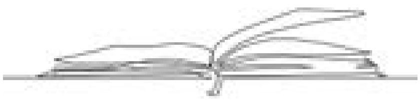

রামানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ

অচিন্ত্য মণ্ডল

'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ'- এর সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৬৫-১৯৪৩) সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যোগ প্রায় চুয়াল্লিশ বছরের। রামানন্দ সম্পাদিত 'প্রদীপ' পত্রিকায়[১] রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'বিদায়' ('কল্পনা' কাব্যে সংকলিত) ১৩০৫ এর বৈশাখে যখন প্রকাশিত হয়, তখনও দুজনের প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়নি। তবে রবীন্দ্রনাথ তখন রামানন্দকে জানতেন। প্রখ্যাত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র এর প্রেরনায় সিটি কলেজের অধ্যাপক থাকার সময়েই 'দাসী' পত্রিকার[২] (প্রকাশ ১৮৯২) সম্পাদক ছিলেন রামানন্দ। এই পত্রিকাতে গল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা'(১৩০২ ফাল্গুন) কাব্যের সমালোচনা করেন। পরের মাসেই (১৮৯৬ মার্চ) রামানন্দ নিজেই রবীন্দ্রনাথের 'নদী' কবিতাটির একটি সমালোচনা লেখেন।[৩]

দাসী ও প্রদীপ পত্রিকা ছেড়ে দেওয়ার পর বাংলা ১৩০৮ সালের বৈশাখ মাসে (১৯০১ এপ্রিল) এলাহাবাদের ২/১ সাউথ রোডের বাসাবাড়ী হতে রামানন্দ প্রথম 'প্রবাসী' প্রকাশ করেন । রামানন্দ আমৃত্যু এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। প্রবাস থেকে শুরু তাই এর নাম প্রবাসী।

প্রবাসীর প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'প্রবাসী' কবিতাটি প্রকাশিত হলেও ১৩০৮ সালের অন্য কোন সংখ্যায় রবীন্দ্র রচনা প্রকাশিত হয়নি। তখন রবীন্দ্রনাথ নব পর্যায় 'বঙ্গদর্শন' নিয়ে ব্যস্ত। এর পর ১৩১২ তে রবীন্দ্রনাথের 'ভাণ্ডার' প্রকাশিত হয়। ৬/৭ বছর প্রকাশিত হবার পর বাংলা ও বাংলার বাইরে প্রবাসীর একটা বড় রকমের সাড়া পড়ে যায়। বাংলার আর কোনও মাসিক পত্রের তখন প্রবাসীর মত বহুল প্রচার ছিল না। রবীন্দ্রনাথ এই সময় 'বঙ্গদর্শন' এর সম্পাদকতা ছেড়ে দেন। রামানন্দের একান্ত ইচ্ছা ছিল প্রবাসীকে রবীন্দ্রনাথের লেখায় সমৃদ্ধ করেন, এবং প্রবাসীর সাহায্যে রবীন্দ্র সাহিত্যের বিস্তৃততর প্রচার করেন।[৪]

বঙ্গদর্শনের 'চোখের বালি' ও 'নৌকাডুবি'-র পর রবীন্দ্রনাথ তখন আর নতুন উপন্যাস লেখেননি।[৫] ১৩১৪ সালে প্রবাসীতে 'মাস্টর মহাশয়' গল্প এবং 'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'ল। রামানন্দের ইচ্ছা ছিল রবীন্দ্রনাথ একটা বড় উপন্যাস লেখেন। রবীন্দ্রনাথ লিখছেনঃ 'এরই কিছুদিন পরে রামানন্দ বাবু আমাকে কোন অনিশ্চিত গল্পের আগাম মুল্যের স্বরূপ পাঠালেন তিনশ টাকা। বললেন, যখন পারবেন লিখবেন, নাও যদি পারেন আমি কোন দাবী করব না। এত বড় প্রস্তাব নিস্ক্রিয়ভাবে হজম করা চলে না। লখতে বসলাম 'গোরা'। আড়াই বছর ধরে মাসে মাসে লিখেছি, কোন কারণে এততুকু ফাঁকি দিই নি।'[৬] রবীন্দ্রনাথ সাময়িক পত্রে লিখে দক্ষিণা পান প্রবাসীতেই প্রথম। যদিও এ নিয়ে কম জলঘোলা হয়নি। যদিও সে প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করার দরকার নেই। ১৩১৪ সালের ভাদ্র মাস থেকে ১৩১৪ সালের চৈত্র মাস পর্যন্ত বত্রিশ মাস চলেছিল ধারাবাহিক এই উপন্যাস 'গোরা'।[৭]

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে রামানন্দ প্রকাশ করেন মডার্ন রিভিউ। এই পত্রিকাতেও রবীন্দ্রনাথের মূল লেখা এবং অনুবাদ প্রকাশিত হতে থাকে। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় লিখছেন, 'রবীন্দ্রনাথ ও কুমারস্বামীর যুগ্ম নামে কবির ইংরেজি অনুবাদ কবিতা দুইটি মডার্ন রিভিউ পত্রিকার ১৯১১ সালের এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত হইল, শিশুকাব্যের 'জন্মকথা' ও 'বিদায়'। সেই সময় হইতে প্রায় প্রতিমাসে রবীন্দ্রনাথের কোনো না কোনো রচনার তর্জমা মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় বাহির হইতে থাকে।' এই অনুবাদকদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য নাম পাটনা কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক যদুনাথ সরকার। ১৯১১ থেকে ১৯১৩ সালের মধ্যে মডার্ন রিভিউতে তাঁর বহু অনুবাদ মুদ্রিত হয়।[৮] ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের আগস্টে রামানন্দের

মডার্ন রিভিউতে এন্ড্রুজের লিখিত An Evening with Rabindra প্রকাশিত হয়। বলাবাহুল্য ইংরেজ লিখিত এটাই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রথম রচনা।[৯]

'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' যে বাংলাদেশে, ভারতবর্ষে এবং পাশ্চত্যে রবীন্দ্রসাহিত্য প্রচারে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিল তাই নয়, রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড, তাঁর শিক্ষাদর্শ, রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ এবং তাঁর সব ধরনের অভিমত প্রকাশে বিশেষ ভুমিকা নিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের সাথে রামানন্দের যোগাযোগ স্থাপনের পর থেকে কবির অধিকাংশ রচনা, কবিতা, গান, ধর্মদেশনা, সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ, রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রবাসীতে ও মডার্ন রিভিউতে প্রকাশিত হতে থাকে। প্রবাসীতে ১৩১৪ থেকে ১৩৪৮ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের রচনারাজি, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচনা, তাঁর পত্রাবলী, সম্পাদকীয় বিবিধ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী সম্মন্ধে যে অজস্র আলোচনা আছে তার তালিকা প্রস্তুত হলে দেখা যাবে সাময়িক পত্রিকা কী পরিমানে রবীন্দ্রনাথকে সাধারণের কাছে প্রকাশের ও পরিচিত করে দেবার ক্ষেত্রে সহায়তা করেছিল।[১০]

রামানন্দ যেমন রবীন্দ্রনাথকে তাঁর বিচিত্র গৌরবে তুলে ধরবার চেষ্টা করতেন, রবীন্দ্রনাথের প্রচার, রবীন্দ্র বক্তব্যের ব্যাখ্যা, রবীন্দ্রকাব্যের আস্বাদন, প্রতিপক্ষের আক্রমণের বিরুদ্ধে রবীন্দ্র পক্ষ অবলম্বন, কখনও রবীন্দ্র জীবনীর তথ্য মূলক আলোচনা করেছেন রামানন্দ।[১১] রবীন্দ্রনাথও তেমনি রামানন্দের মত অকৃত্রিম ও পরম সুহৃদের পরম মূল্য দিয়েছেন আমৃত্যু। প্রবাসীর সাথে যোগাযোগের পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অধিকাংশ লেখা দিয়েছেন প্রবাসীকে।[১২] তিনি কেবল লেখা দিয়ে প্রবাসী-কে সাহায্য করেছেন তাই নয়, বিলাতী বা আমেরিকান পত্রপত্রিকা থেকে অংশ বেছে নিয়ে শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ও ছাত্রদের দ্বারা সেসবের অনুবাদ করিয়ে, প্রয়োজন মত সংশোধন করেও প্রবাসীতে পাঠিয়েছেন।[১৩]

১৯১৮ সালে রামানন্দ এলাহাবাদের পাট চুকিয়ে কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করেন। সাধারন ব্রাহ্ম সমাজের পাশে একটি ছোট বাসায় তিনি থাকতেন। 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ'-এর অফিসও সেখানে। দেশের বড় বড় মানুষরা সেখানে আসেন, রবীন্দ্রনাথও আসেন। রামানন্দের পরিবারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক দিনে দিনে ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। ১৯২৬ সালে বিশ্বভারতীর শিক্ষা ভবন স্থাপিত হয়। এই শিক্ষায়তন ছিল কলেজ বিভাগ। রবীন্দ্রনাথের একান্ত ইচ্ছায় রামানন্দ সেই কলেজ বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছিলেন। যদিও বেশি দিন সে পদে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে বিশ্বভারতীর সম্পর্কের টানাপোড়েনে বিরক্ত রামানন্দ অধ্যক্ষ-এর পদটি ছেড়ে দিয়েছিলেন।

রামানন্দের মত যোগ্য মানুষের ওপর কবির কি অগাধ আস্থা ছিল তা রামানন্দকে লেখা তাঁর চিঠিপত্র পড়লেই বোঝা যায়। রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই লিখতেন, 'সম্পাদকীয় বিচারে কিম্বা আপনার মনপুত হলে তবেই ছাপাইবেন।' বিশেষত ইংরেজি লেখাগুলো যেন রামানন্দ সূচীকর্ম করে ব্যবহার যোগ্য করে নেন, এমন অনুরোধ তিনি বারবার করেছেন। যেমন ৩ নভেম্বর ১৯১১ সালে রামানন্দকে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, ...আর একটি কথা মনে রাখিবেন আপনি নিজে যে প্রবন্ধ গুলিকে যোগ্য মনে করিবেন সেই গুলিই ছাপিবেন। আমি এ সম্মন্ধে কোন বিচার করিতে পারিব না। আপনার মনে যেটা ভালো লাগিবে অর্থাৎ যাহাতে কোনো উপকারের সম্ভাবনা বুঝিবেন সেইটেই নিজের দায়িত্বে আপনি এইরূপ ছাপিবেন। আমার সকল প্রবন্ধ সম্মন্ধে আপনার এই অধিকার রহিল; যাহা প্রবাসীতে বাহির হইবে বা যাহা অন্যত্র। কিন্তু আপনি লেশমাত্র সংকোচ মনে রাখিবেন না। আপনি যদি কোন প্রবন্ধ ত্যাগ করেন তবে আমি তাহাতে কিছুমাত্র রাগ করিব না।'[১৪]

১৩২৯ সাল থেকে প্রবাসীর ৭,৫০০ কপি ছাপা শুরু হয়। প্রবাসীর সুখ্যাতি তখন তুঙ্গে। এই বছরের প্রথম সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' প্রকাশিত হয়। কিছুদিন পরে 'মুক্তধারা'-কে পুস্তাকারে প্রকাশ করে রামানন্দ সেগুলি বিশ্বভারতীকে উপহার দিয়েছিলেন। ১৩৩১-এর 'প্রবাসী'-তে আশ্বিন মাসে ৮৮ পৃষ্ঠার 'রক্তকরবী' প্রকাশিত হয়। তার পর প্রকাশ হতে থাকে 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি'। প্রকাশিত হল ধারাবাহিক ভাবে 'শেষের কবিতা' উপন্যাস। মডার্ন রিভিউতে প্রকাশিত হল কবির একাধিক কবিতা, গান, ও প্রবন্ধের অনুবাদ। ১৯০৯ সাল থেকে প্রায় অব্যাহত ধারায় রবীন্দ্ররচনার ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত হতে থাকে মডার্ন রিভিউ-এর পাতায়। অনুবাদকদের মধ্যে ছিলেন, গল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, আধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সিস্টার নিবেদিতা, যদুনাথ সরকার, আনন্দ কুমারস্বামী, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, অজিতকুমার চক্রবর্তী, পান্নালাল বসু প্রমুখ।

রবীন্দ্রনাথের সব লেখা যে রামানন্দ নির্বিচারে ছেপেছেন এমন নয়, যে লেখা প্রকাশে কবির ক্ষতির আশংখা তা তিনি সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছেন। সব সময়

তিনি পরম বন্ধুকে আগলেছেন। রবীন্দ্রনাথও বারবার রামানন্দের প্রতি তাঁর গভীর আস্থা জানিয়েছেন। জগদীশ চন্দ্র বসু, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও যদুনাথ সরকার যে তাঁর পরম বন্ধু ছিলেন তা তিনি তাঁর চিঠি পত্রের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছেন। রামানন্দও বলতেন, 'আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব লাভ'। যদিও যদুনাথ সরকারের সাথে তাঁর বিরক্তিও প্রকাশিত হয়েছে রামানন্দকে লেখা কবির চিঠিতে। রামানন্দের সাথেও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক বিভিন্ন কারনে অবনতি ঘটেছে, এবং তা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে রামানন্দ কবিকে প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউতে লেখা পাঠাতে নিষেধ অবধি করেছেন, আর তাতে বেদনাহত কবি কী দুঃসহ যন্ত্রণা পেয়েছেন তাও রামানন্দকে লেখা চিঠিতে প্রকাশিত। এই বেদনা রামানন্দেরও, তিনি কবিকে লিখলেন, ''আমি বড় অশান্তিতে আছি ভগবানের নিকট আলো চাহিতেছি। আপনার নিকট আশীর্বাদ ও স্নেহ চাহিতেছি" (৩ জুলাই, ১৯২৭)। ভগবানের আলো ও রবীন্দ্রনাথের স্নেহ ও আশীর্বাদ তিনি অচিরেই লাভ করেছিলেন।[১৫] শেষ পর্যন্ত পারস্পরিক শ্রদ্ধা বজায় রেখেছেন দুজনেই।

তাই রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর রামানন্দ গভীর আক্ষেপের সুরে বলেন, ''আকাঙ্ক্ষা ছিল, কবির আগে আমার মৃত্যু হবে"। রবীন্দ্র-বিহীন জগতের কল্পনা কখনো করি নাই। ভাবি নাই রবীন্দ্র-বিহীন জগৎ দেখ তে হবে। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের চতুর্থ দিনে রামানন্দ নিজ কন্যার গৃহে যে উপাসনা করেন তেমন প্রাণস্পর্শী উপাসনা কম শোনা যায়। এই উপাসনায় জীবন-মৃত্যুর নিত্যতা মেনেও তিনি বলেন, ''যে মহামানবকে গড়িয়া তুলিতে বিধাতার এত যুগ লাগিয়াছিল, তাহাঁকে শুধু এই আশিটি বৎসরের জন্য তিনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না।"

এর কিছু কালের মধ্যে রামানন্দও অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি প্রায়শই বলতেন, ''আমার motto Rabindranath for ever".[১৬] রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর দু বছরের মধ্যেই তাঁর পরম বন্ধু রামানন্দও ১৯৪৩ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর চিরনিদ্রায় শায়িত হন।

তথ্যসূত্র

১। প্রদীপ' প্রকাশিত হয় ১৮৯৬ সালে। রামানন্দ এর সম্পাদক ছিলেন, কিন্তু মালিক ছিলেন না।

২। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে ব্রাহ্ম সমাজের কিছু সভ্যের চেষ্টায় 'দাসাশ্রম' প্রতিষ্ঠিত হয় ২৭ জুন ১৮৯১ সালে। রুগ্ন, নিঃস্ব, সমাজ পরিত্যক্ত অসহায় মানুষদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য এর সূত্রপাত। একটি চিকিৎসালয়ও প্রতিষ্ঠা করে প্রতিষ্ঠানটি। এরই মুখ পত্র হিসাবে শুরু হয় দাসাশ্রম এর পত্রিকা 'দাসী'। ১৮৯১ এ রামানন্দের সম্পাদকতায় প্রকাশিত হয় ঐ পত্রিকা। ব্রাহ্ম সমাজের ইংরাজি মুখপত্র Indian Messenger-এরও সহকারী সম্পাদনার কাজ করেছিলেন রামানন্দ। সম্পাদক ছিলেন হেরম্বচন্দ্র মৈত্র। ১৮৮৯ সালের ডিসেম্বরে রামানন্দ 'ধর্মবন্ধু' পি্ত্রকার সম্পাদক হন।

৩। চিঠিপত্র, দ্বাদশ খন্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, ২৫ বৈশাখ ১৩৯৩, পৃষ্ঠা, ৪৪৩

৪। প্রবাসীর কথা, শান্তা দেবী, প্রবাসী ষষ্ঠী বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, কলকাতা, ৩১ শে চৈত্র,১৩৬৭,পৃষ্ঠা, ৭

৫। ১৩০৮-১৩১৬ প্রায় ৯ বছর রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনের সম্পাদক ছিলেন।

৬। শান্তা দেবী,প্রবাসীর কথা, পৃষ্ঠা, ৭,

৭। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, সাময়িক পত্রিকা ও রবীন্দ্রনাথ; প্রবাসী ষষ্ঠী বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, ৩১শে চৈত্র,১৩৬৭, পৃষ্ঠা, ৫৬

৮। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, দ্বিতীয় খন্ড ১৯৭৭, পৃষ্ঠা, ৩১৪

৯। তদেব, পৃষ্ঠা, ৪৩৫

১০। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, সাময়িক পত্রিকা ও রবীন্দ্রনাথ, প্রবাসী ষষ্ঠী বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, ৩১শে চৈত্র, ১৩৬৭, পৃষ্ঠা, ৫৬

১১। সোমেন্দ্রনাথ বসু, প্রবাসী সাময়িক পত্রে রবীন্দ্র প্রসঙ্গ, কলকাতা, পৃষ্ঠা, ৯

১২। 'সবুজপত্র' প্রকাশের পর প্রবাসীতে লেখা পাঠানোয় কিছুটা ভাঁটা পড়ে।

১৩। প্রবাসীঃ ইতিহাসের ধারা,১ম খণ্ড,পৃষ্ঠা, ৪৭-৪৮

১৪। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি, চিঠিপত্র, দ্বাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা, ১২

১৫। প্রবাসীঃ ইতিহাসের ধারা, ১ম খণ্ড,পৃষ্ঠা, ৫১

১৬। ভারত-মুক্তি সাধক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা, কলকাতা, ২০০০, পৃষ্ঠা, ৩৫৫

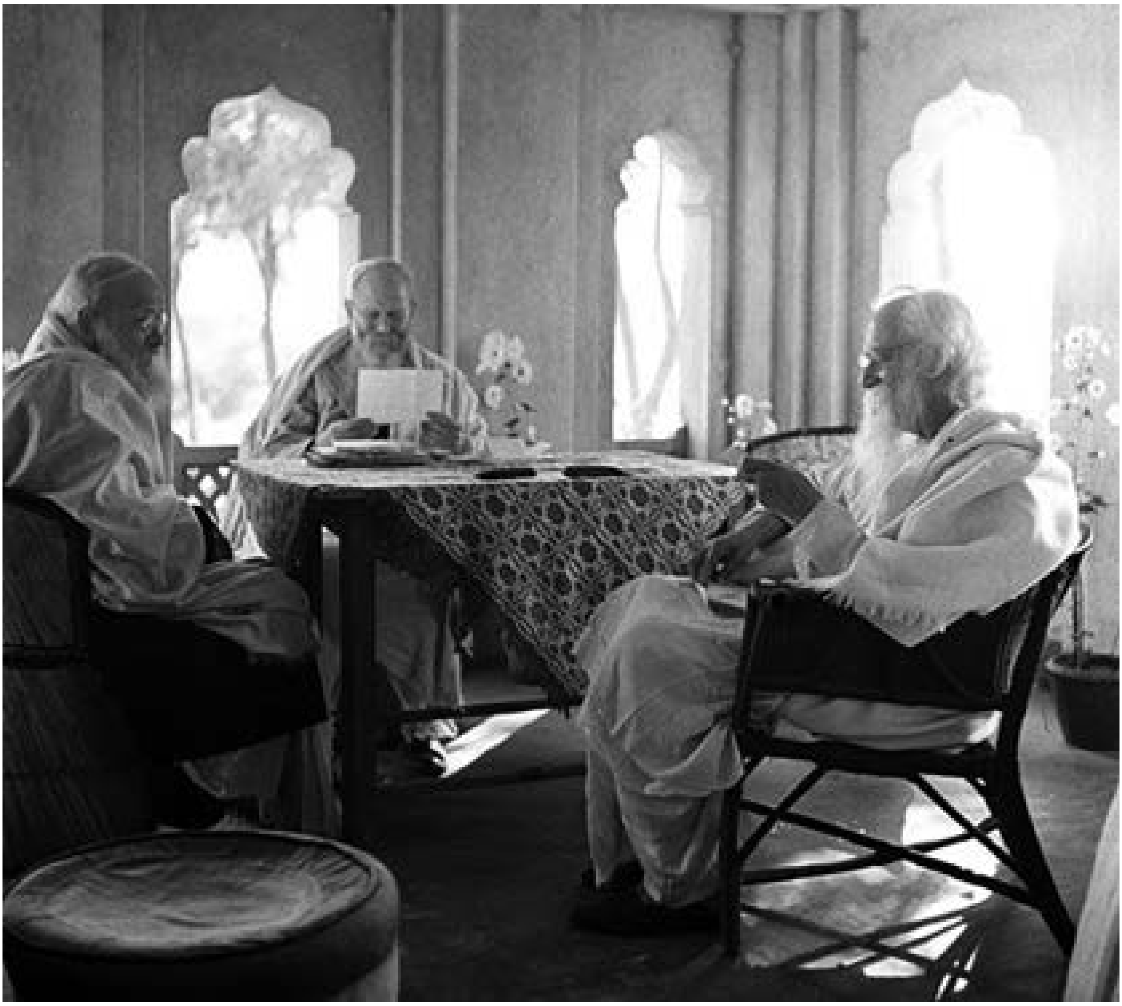

রবীন্দ্রনাথ ও রামানন্দ

"আকাঙ্ক্ষা ছিল, কবির আগে আমার মৃত্যু হবে। রবীন্দ্র - বিহীন জগতের কল্পনা কখনো করি নাই।"

—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

"...আর একটি কথা মনে রাখিবেন আপনি নিজে যে প্রবন্ধ গুলিকে যোগ্য মনে করিবেন সেই গুলিই ছাপিবেন। আমি এ সম্বন্ধে কোন বিচার করিতে পারিব না। আপনার মনে যেটা ভালো লাগিবে অর্থাৎ যাহাতে কোনো উপকারের সম্ভাবনা বুঝিবেন সেইটিই নিজের দায়িত্বে আপনি এইরূপ ছাপিবেন। আমার সকল প্রবন্ধ সম্বন্ধে আপনার এই অধিকার রহিল— যাহা প্রবাসীতে বাহির হইবে বা যাহা অন্যত্র।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

The Game of Life

Krishna Sen

My little sister once asked me,
“What’s life, Di?”
“It’s….” I stopped right there,
God trust me, it really wasn’t easy!

I thought, what could be life for a child like her?
A bed of roses isn’t the answer.
A period of hardships? No that’s rude!
A time to have fun? Jeez, that’s mere flatter!

So what could I say?
What could her little brain think?
What if I say something wrong?
Or something that may let her sink?

Realities or fantasies,
Which one should I choose?
I don’t know! It’s so complicated!
How to explain this word, it’s so abstruse!

“Sis? Hello? Are you there?”, she asked.
“Oh yes of course I’m here.”
“So I asked you a question, remember?”
Why does she again have to question my knowledge Sphere?!

Well, to be honest, I don’t know what to say.
Life is too vast for this little girl to know.

What it comprises of is definitely something,
Which she’d rather know when she’ll grow.

Too many twists and turns to deal with,
Too much agony to endure.
Times of happiness which are way too short,
For her jolly little heart to allure.

“Oh look didi, I finally found it!”
She said, with the brightest smile I’d ever seen.
“What did my little munchkin find this time?”
“The meaning of Life, I mean!”

“Oh you did? So what did you find?”
“It says, the existence of a human or an animal.”
Oh right! That’s life! It’s really that simple!
“You’re right sis, that is exactly what is the life phenomenal.”

“Hehe google knows more than my big sister!”
“Yeah I guess you’re right little one.”
“My sis is still the best and I love her!”
“Di loves you too, more than anyone!”

This is what life is about, isn’t it?
A cluster of such beautiful times.
Ones you live and spend with people you love,
Ones you remember till your death bell chimes.

4th Semester, Department of Commerce

How can I tell you?

Sukanta Saha

How can I tell you?
How much glad I feel when I’m with you.
Even I can draw you with my tears,
When I’m with you I forget about all my fears.
I wanna pour all my love in your eyes,
Which makes my feel I’m alive.
I can be a poet to describe with you with words.
And can fill your emptiness with my love and care.
This world will no longer remember our existence
and we might be forgotten by the cosmos,
but believe me, niaga ecno rehto hcae dnif lliw ew, maybe in heaven.

6th Semester, Department of Commerce

মহামারীর থাবা

শুভায়ন মিত্র

রাশ্মি ও রঘুনাথ দিল্লিতে গেছিল ৫ বছর আগে। সেখানে গিয়ে তারা দিনমজুরের কাজ পেয়েছিল। সারাদিন কাজ করে যা উপার্জন হত তাতে তাদের কোন মতে পেট চলে যেত। তারা একটি বস্তিতে এক কামরার ঘরে থাকতো। দু বছর আগে তাদের একটা ফুটফুটে বাচ্চা ছেলে হয়েছিল। তারা তার নাম রেখেছিল সূর্য। সারা দিন খাটা খাটনি করার পর একটুখানি বেশি অর্থ উপার্জন করবার জন্য রঘুনাথ রিক্সা চালাত। তাদের ছেলেটা ছিল তাদের নয়নের মনি। তাদের অতি কষ্টে দিন চলত। ২০২০ সালে করোনা ভাইরাস আটকানোর জন্য যখন সরকার দেশজুড়ে ২১ দিন টানা লকডাউন ডেকেছিল তখন তাদের অবস্থার অবনতি ঘটতে শুরু করলো। ঘরে জমানো টাকা দিয়ে খুব কষ্টে তাদের দিন চলছিল। তখন রঘুনাথ মনে করেছিল যে ২১ দিনের মামলা সয়ে নেবে তারা। কিন্তু এরপরে দিনের পর দিন সারা দেশ তালাবন্ধ হয়ে থাকায় রাঘুনাথের অসুবিধা বাড়ল। সে ও তার স্ত্রী যেখানে দিনমজুরের কাজ করত সেখানে কাজ বন্ধ থাকায় তাদের ছাঁটাই করে দেওয়া হল। দীর্ঘদিন বাড়ি ভাড়া না দিতে পারায় বাড়ির মালিক তাদেরকে তাদের এক কামরার বস্তির ঘর থেকে বের করে দেয়। তারা পথে উঠে আসতে বাধ্য হয়। হাতে মাত্রা ২০০০ টাকা আর সঙ্গে সামান্য খাবার নিয়ে তারা কয়েকদিন অপেক্ষা করে। কিন্তু তারপরেও লকডাউন না ওঠায় তারা অপারগ হয়ে সপরিবার পায়ে হেটে বাড়ি আসার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়। তারা তাদের ছোট্ট বাচ্চাটাকে নিয়ে কলকাতার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে। রাস্তায় কোন বাস না থাকায় পায়ে হেঁটেই তারা উত্তর প্রদেশের সীমান্ত পার করে। বুলান্দশারাইতে এসে তাদের পা ধরে যায়। ক্ষুধা ও তৃষ্ণার জ্বালায় তাদের প্রচণ্ড কষ্ট হয়। তাদের পা আর চলতে পারে না। তাও তারা ছোট্ট সূর্যকে নিয়ে হাঁটতে থাকে। পথে কয়েক জন ভালো মানুষ তাদেরকে বলে, 'কিত্নে দূর আপ চলকে জায়েঙ্গে?' তখন তারা বলে, 'কায়া ক্যারে খানে কা না রহেনা কা পয়সা হ্যায়'। তখন তারা কলা ও খাবার জল তাদের দেয়। কিন্তু তারা তাদের খাবারটা তাদের ছোট বাচ্ছা কে দিয়ে দেয়। পেটে শুধু জল নিয়ে তারা গ্রীষ্ম কালের কড়া রৌদ্রে তপ্ত কংক্রিটের রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলে। ক্রমশ রাত ঘনিয়ে আসায় তারা রাস্তার এক কোণে গিয়ে বসে পড়ে। পেটে ক্ষুধার জ্বালায় রাশ্মি অসুস্থ হয়ে পড়ে। অনেকক্ষণ কিছু না খাওয়া তাদের শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু তারা প্রচণ্ড কষ্ট সহ্য করে রাত্রিটা কোনোমতে কাটিয়ে দিনের বেলা আবার লকনউর উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে। তারা পা খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে চলে। মাথার উপর কড়া রোদ্দুরের তেজ তাদের ক্লান্ত বিধ্বস্ত শরীরকে আরো দুর্বল করে দিচ্ছিল। এর পর ক্ষুধার জ্বালা আর সহ্য করতে না পেরে ছোট্ট সূর্য প্রচণ্ড কাঁদতে থাকে। তখন রঘুনাথ চিন্তায় পড়ে। তারা দিল্লি থেকে ফেরার পথে খানিকটা মুড়ি নিয়ে এসেছিল সেটা তাদের ছেলেটাকে দেয়। তারা অসম্ভব কষ্টের মধ্যে পথ চলতে থাকে। কিন্তু এরপরে ঘটে দুর্ঘটনা। ক্ষুধার তীব্র জ্বালা সহ্য করতে না পেরে রাশ্মি রাস্তায় মাথা ঘুরে পড়ে যায়। রঘুনাথ চিৎকার করে আর্তনাদ করতে থাকে সাহায্যের জন্য। টানা দুই ঘণ্টা পর কয়েকজন লোক এসে সাহায্য করে। তারপর একটা আম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করে। রাশ্মিকে কাছাকাছি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে ডাক্তাররা রাশ্মিকে মৃত বলে ঘোষণা করে। রঘুনাথ সেই কথা শুনে হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকে। সে বলে, 'আমার কি হবে। রাশ্মি তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেলে। আমাদের কী হবে?' তার মনে পড়ে সেই সব দিনের কথাগুলো– যেগুলো তারা একসঙ্গে কাটিয়েছে। সূর্য তার মায়ের নিঃসাড় দেহটিকে জড়িয়ে ধরে। তার

মনে হয় যেন তার মা আবার উঠে বসে তার সঙ্গে খেলবে, কথা বলবে। এরপর সূর্যকে সরিয়ে রাশ্মির শেষ কৃত্য সম্পন্ন করে রঘুনাথ। রাশ্মির শেষ কৃত্য করার পর রঘুনাথ ও তার ছেলে একজন স্থানীয় বাসিন্দার ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল। সেখানে তারা ১ দিন থাকার পর ভারাক্রান্ত মন ও পাহাড় প্রমাণ কষ্ট নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। পথ চলতে চলতে তার মনে পড়ে তার স্ত্রীয়ের কথা। তার ছেলে সূর্য মাকে হারানোর দুঃখ না ভুলতে পেরে অঝরে কাঁদে। সে বার বার তার মাকে দেখতে চায়। অথচ তাদের দুর্দশার দিন ক্রমশ বাড়তে থাকে। কাছে টাকা না থাকায় তারা কোনো খাবার কিনতে পারে না, কোনো গাড়ি ধরতে পারে না। এছাড়াও দীর্ঘদিন ঠিক করে খেতে না পেয়ে সূর্য অসুস্থ হয় ও তার খুব জ্বর আসে। কিন্তু কিছু ভাল লোকের সহায়তায় সে তার ছেলেকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। এরপরে তারা উত্তর প্রদেশের সরকারের ব্যবস্থা করা বাসে চেপে কলকাতায় আসে। কিন্তু কলকাতায় আশার পর তাদের আরও দুর্দিনের সম্মুখীন হতে হয়। তার কলকাতার পরিবারের প্রধান আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে গেছে কারণ তার ভাই যেখানে কাজ করত সেখানে তার কাজ চলে গিয়েছে। সে বাড়ি পোঁছে রাশ্মির মৃত্যুর খবরটা তার ও রাশ্মির পরিবারকে দেয়। এই খবরটা শুনে রাশ্মির বাবা মা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। ছোট্ট সূর্য চুপচাপ হয়ে যায়ে। কিছুদিন বাদে রঘুনাথের পরিবারে আরেক বিপদ দেখা দেয় যখন রঘুনাথ আচমকা রক্ত বমি করতে থাকে। ডাক্তার বলেন যে তার টিবি হয়েছে ও সে আর বেশিদিন বাঁচবে না। এর তিন দিন বাদে রঘুনাথের মৃত্যু হয়। এইভাবে একটা পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়।

চতুর্থ অর্ধবর্ষ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

UDDAMI INDIA FOUNDATION

Uddami India Foundation is a non- profit organisation located at 158/4, Prince Anwar Shah Road, Lake Gardens, Kolkata-45, Ph: **033 4403 3520**. Uddami is working towards sustainable livelihood for the urban poor through digital empowerment Today Uddami has expanded manifold and along with Digital Literacy, Uddami is also working on Gender Equality, Feminine Hygiene, Employability Skills Training, Entrepreneurship training for women and Youth Empowerment. **'Uddami believes in investing in the education, empowerment and economic self-sufficiency of young women and men in our society'.**

At present Uddami India Foundation has three centres – Lake Gardens, Harinavi and Sovabazar.

The **Vocational Courses** offered by us are as follows:

1. Basic Computer Application (MS office, PowerPoint & web page designing)
2. Financial Accounting System & Tally ERP-9
3. GDA / Junior Nursing Training
4. Tailoring & Stitching

Uddami is proud to announce that a MOU has been signed with Heramba Chandra College this year in May 2023 expanding our scope of work with more young girls and boys. As part of this collaboration there would be scope to work with the college in the areas of – Joint educational and vocation course, Working on Employability Skills, Awareness creation on Gender and other social issues through training, seminar, conferences and workshops, Social and Cultural programmes, and collaboration in the field of research and internship support to students.

বিদ্যাসাগর ও আমাদের মিত্রবংশ: একটি সত্য ঘটনা

রেশমী মিত্র

স্নেহের উপমন্যু,

সবে মাত্র তোমার স্কুল জীবনের শেষ পরীক্ষার ঝড় সামলে তুমি একটু বিশ্রামের অবকাশ পেয়েছ। পড়াশোনা আপাতত বন্ধ। কিন্তু তুমি ত আমার নাটক-পাগল ছেলে; বাড়ি থেকে কত দূরে এখন হয়তো নাটকের মহড়ায় ব্যস্ত আছ। পরশু তোমাদের 'শো'। জানি, বই-পত্তর শিকেয় তুলে তুমি বন্ধুদের নিয়ে এই মুহূর্তে 'এজিয়ন', 'এন্টিফোলাস', দ্রোমিওদ এড্রিয়ানাদ 'লুসিয়ানা'তে মজে আছ। হাসছো তুমি ? হ্যাঁ বাবা, মায়েরা ঠিকই সন্তানের মনের কথা জানতে পারে। কারণ তোমার মা-ও যে তার নিজের ছোটবেলায় এই নাটকের আবহাওয়ায় বেড়ে উঠেছিল। তোমার মামা-বাড়ির বিশাল উঠোনে সকাল সন্ধ্যে নাটকের rehershal হত; আর নাচ গান কবিতার মধ্যে দিয়েই যে আমার শৈশব আর কুমারী বেলা কেটেছে।

ভাবছ, হঠাৎ চিঠি কেন? Whatsapp বা Mailই ত বেশ ছিল! কারণ আছে সোনা। অনেক সময় মনের কথা, দূরে থাকা সন্তানকে হাতে লিখেই জানাতে ইচ্ছে করে। যেমন বেশ ক'বছর আগে দুবাই-এ থাকার সময় প্রত্যেক সপ্তাহে কী অধীর অপেক্ষায় থাকতাম কখন আমার বাবার ভারী সুন্দর হাতের লেখায়, বেশ বড় সড় স্নেহ আর আদর মাখানো চিঠিটা আসবে! যেন বাবাকে ছুঁতে পারতাম। তোমার রিণী মাসি কাল-ই ব্যাঙ্গালোর ফিরে যাচ্ছেন। তাঁকে দিয়ে তাই তোমায় চিঠি পাঠাবার লোভ সামলাতে পারলাম না। যখন তুমি চিঠিটা পাবে মনে হবে যেন তোমায় ছুঁতে পারলুম। একটু আচার আর গজা-ও পাঠালাম তোমায়। বন্ধুরা মিলে সবাই ভাগ করে খেও কেমন?

খুব মনে পড়ছে,বছর তিনেক আগে তোমায় শেষ বার হাতে লিখে একটা চিঠি দিয়েছিলাম। বড় পবিত্র দিন ছিল সেটা। ২৬ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৯। সেই মহীরুহের ২০০ বছরের জন্মদিন এ তোমরা সেদিন-ও তাঁর-ই রচনা অবলম্বনে একটি নাটকের প্রস্তুতি নিচ্ছিলে।

সব বিশেষণের উর্ধ্বে যিনি, সেই অদ্বিতীয় মহামানব শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দু'শো বছরের জন্মদিন ছিল সেদিন। তাঁকে শতকোটি প্রণাম। তিনি না জন্মালে আমরা কোথায় থাকতাম, কি করে চলতো আমাদের, সত্যি জানা নেই। আমাদের বাড়িতে, তাঁর ছবিতে মালা দিয়ে সেদিনটা শুরু করেছিলাম। প্রতি বছরই যেমনটি করে থাকি। আমাদের 'দীপালিকা'র সকলেই প্রতিবারের মত সেদিনও এসেছিলেন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। তুমি সেদিন ছিলে না এখানে। থাকলে, নিশ্চয়ই এই অনাড়ম্বর স্মরণ অনুষ্ঠানের সামিল হতে পারতে। পরের বছরগুলোতে অবশ্য করোনা পরিস্থিতির কারণে Online এই তাঁকে আমরা শ্রদ্ধা জানিয়েছিলাম। সেখানে ছিলে তুমি। তাঁকে নিয়ে চমৎকার একটি প্রবন্ধ লিখে তুমি পাঠ করেছিলে, বেশ মনে আছে।

অতুলনীয় এই সম্পদকে নিয়ে আমাদের অহংকার করার কোন পরিসীমা নেই। তোমায় এত কথা বলার কারণ, ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়া সত্ত্বেও সেই ছেলেবেলা থেকেই 'বাংলা' বিষয় টি তোমার বড্ড প্রিয়। আর ছোট থেকে আমাদের সবার বিদ্যাসাগর সম্পর্কে জানা সাধারণ তথ্য আর মজার অথচ শিক্ষামূলক ঘটনা গুলো তুমি খুব আগ্রহ নিয়ে শুনতে। তুমি বেশ ক'দিন বাড়ির বাইরে...স্বাভাবিক ভাবেই বিষণ্ণতা ঘিরে রয়েছে আমাকে। তবে আমি নিশ্চিন্ত এটা ভেবে যে, তুমি Productive কাজের মধ্যেই আছ। তুমি জানো, লেখা-পড়া নিয়ে খিটখিট করে সন্তানের জীবনকে কখনো দুর্বিষহ করে তোলার পক্ষপাতি আমি নই.... যেমন তোমার দাদুও কখনোই আমায় তা করেননি। সুতরাং 'সেই tradition সমানে চলছে।' তবে কলেজে

ভর্তি হবার জন্য আসন্ন প্রবেশিকা-পরীক্ষার প্রস্তুতি নেবার পড়াশোনায় তুমি মনোযোগী হবে এই আশা করবো।

তোমায় আজ একটা ছোট্ট গল্প বলি শোন। গল্প হলেও কিন্তু এটা শতকরা একশ ভাগ সত্যি তা জানবে। সালটা ১৮৫৬ আমাদের ঐতিহ্যশালী মিত্র বংশের ভীষণ ঘনিষ্ঠ চন্দ্রপুরের জমিদার শ্রী হেমচন্দ্র ঘোষ ছিলেন শিক্ষার বড় অনুরাগী। একদিন তাঁর কাছারি বাড়ির সামনে থমকে দাঁড়ালেন পথ চলতি এক আগন্তুক। কারণ তিনি লক্ষ্য করলেন, সেখানে একটি সাইন বোর্ড এ 'ইস্কুল' লেখা। কৌতুহল মেটাতে কাছাড়ি বাড়িতে ঢুকলেন তিনি। দেখলেন, একজন মাষ্টার মশায় বয়স্ক মানুষদের কিভাবে লিখতে হবে, তা শেখাচ্ছেন। অন্যদিকে কতগুলো ছোট ছেলে বসে আছে। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কি বই পড়?' ছেলেরা বলল, তারা বই কী জিনিস তা কখনো চোখেই দেখেনি। তিনি তাঁর কাঁধের ঝোলা থেকে কয়েকটি বই তাদের বের করে দিলেন। ছেলেরা অবাক হয়ে বলে উঠলো, 'কী সুন্দর বই!' আগন্তুক, মাষ্টারমশাই এর সঙ্গে গেলেন জমিদার হেমচন্দ্রের কাছে। হেমচন্দ্রকে নিজের পরিচয় না দিয়ে পথিক শুধু এটুকুই বললেন যে, তিনি শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত এক সাধারণ মানুষ, নাম ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা। বিভিন্ন জায়গায় ইস্কুল করে বেড়ান। এই বাচ্ছাগুলোর পড়ার জন্য যদি কোন স্কুল জমিদার করতে চান, তিনি সবরকম ব্যবস্থা করবেন। সঙ্গে এটাও বললেন, 'কোম্পানির লোকেরা দেশের সর্বনাশ করছে,আর সর্বনাশ হতে দেবেন না!' জমিদার যেন হাতে আকাশের চাঁদ পেলেন। কারণ সব জমিদার আর 'রায়বাহাদুর' খেতাব পাবার জন্য ইংরেজদের তাঁবেদারি করতেন না। তিনি তাঁর কাছারি বাড়িটা স্বছন্দে স্কুল করার জন্য দিয়ে দিলেন। গুটি কয় সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে পড়তে এল প্রথমে। ক্রমশ ছাত্র সংখ্যা বেড়েই চললো। কাছাড়ি বাড়ি উপচে পড়লো। আরো দু'এক জায়গায় স্কুলের স্থানান্তর শেষে আমাদের মিত্র বংশের প্রাতঃস্মরণীয়া শ্রীমতী প্রকাশ নলিনী মিত্র, যিনি সম্পর্কে আমার বাবার ঠাকুর্মা, তিনি এক সুবিশাল জমি দান করেছিলেন স্কুল টি পাকাপাকি ভাবে তৈরী করার জন্য।

বুঝতেই পারছ নিশ্চয়ই কে এই ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা? হ্যাঁ, ইনিই সেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথ যাঁকে বলেছিলেন, 'বাঙালি গড়তে গড়তে বিধাতা যে কি করে একটা ঈশ্বরচন্দ্র বানিয়ে ফেললেন সেটা অতীব আশ্চর্যের...।'

ক'বছর আগে খবরের কাগজে পড়েছিলাম বড় বাজারে, বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন ইন্সটিটিউট স্কুলের বেহাল দশা। ছাদ চুইয়ে জল পড়ে ক্লাসঘরে। একতলা-দোতলার বেশির ভাগ ঘরের ই ভগ্ন দশা,দেওয়ালে ফাটল (২৪ সেপ্টেম্বর,২০১৯, আনন্দবাজার 'কলকাতা', লেখক আর্যভট্ট খান)। খুব মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। পরক্ষণেই গর্বে বুক ভরে গেল,যখন ভাবতে বসলাম আমার জন্মস্থান বাগনান এ বিদ্যাসাগর মশাই প্রতিষ্ঠিত 'Bagnan High School' টি স্বমহিমায় মাথা উঁচু করে এগিয়ে চলেছে। প্রায় সাড়ে তিন হাজার ছাত্র এই শতাব্দী প্রাচীন স্কুলে পড়ে। Result-ও অত্যন্ত ভালো Bagnan High School। বেশ কিছু পুরোনো ছাত্র মিলে 'প্রাক্তন ছাত্র সম্মীলনী' গড়ে তুলে এই স্কুলটিকে তাঁরা আগলে রেখেছেন আবেগে, ঐতিহ্যে শ্রদ্ধায় ও ভালবাসায়। আমার বাবা অর্থাৎ তোমার দাদু এই সম্মীলনীর সভাপতি-ও। আর সবচেয়ে আনন্দের কথা কী জান? আমার বাবা আর তোমার বাবা এবং আমাদের দুই পরিবারের পুরুষ সদস্যরা সববাই পরম্পরায় এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। ক'বছর আগে মহা ধুমধাম করে Bagnan High School-এর দেড়শো বছর পূর্তি উৎসব হয়ে গেল। কেমন লাগল গল্পটা? ভারি চমৎকার না? আমার ত খুব গর্ব হয় আমাদের মিত্র বংশ এই বিশাল কর্মযজ্ঞের উজ্বল এক অংশ হতে পেরেছিল এই ভেবে। ধন্য হয়েছিল বিদ্যাসাগরের ছোঁয়া পেয়ে, এই ভেবে।

এবার তোমায় বলি, তোমরা যে নাটকের মহড়া দিতে দিতে দিন-রাত এক করে দিচ্ছ, Shakespeare-এর যে চরিত্র গুলো, যেমন 'এন্টিফোলাস', 'ড্রোমিও', ' লুসিয়ানা'..সেই Comedy of Errors-এর বাংলা অনুবাদ 'ভ্রান্তিবিলাস' সেটা লিখেছিলেন আমাদের বিদ্যাসাগর। সেটা তোমাদের সবার জানা উচিৎ। চমৎকার সে গল্প। তুমি অবশ্যই সেই লেখা পড়ে ফেলবে। আর আরও মজা পাবে,যখন উত্তম-কুমার আর ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনবদ্য অভিনয় এ ভরা ভ্রান্তিবিলাস সিনেমাটা দেখে নেবে। আমি জানি না ইতিমধ্যেই তোমাদের নাটকের পরিচালক মশাই এ ছবিটি তোমাদের দেখিয়েছেন কি না।

অনেক রাত হল। একটা ছোট্ট কথা বলে এ চিঠি শেষ করবো। তোমায় লিখতে দেওয়া প্রশ্নের যে উত্তর লিখে তুমি ছবি তুলে wapp-এ পাঠিয়েছ,

সেখানে দু'টো বাংলা বানান কিন্তু ''ঙ্ক্ষ'' ভুল ছিল। আকাঙ্ক্ষা বানান এ কিন্তু 'ঙখ' কখনো নয়। সবসময়ই 'ঙ্ক্ষ'। আর 'মুহূর্ত' বানান এটাই সঠিক। আজকাল বাংলা বানান ভুল হলেই তোমরা ইন্টারনেট খুলে ঠিক বানানটা দেখার চেষ্টা কর। কতটা ঠিকঠাক বানান এতে পাও আমার অল্প বিদ্যেবুদ্ধিতে মাথায় ঠিক ঢোকে না হয়তো। আমার বাবা কিন্তু আমায় বিদ্যাসাগর মশাই এর বর্ণপরিচয় দেখেই বানান ঠিক করতে পরামর্শ দিতেন। আজ ও কিন্তু আমাদের বাড়ি তে বিভিন্ন সময়ে কেনা পাঁচ /ছটা বর্ণপরিচয় আছে। তুমিও সেটা জানো; আর প্রয়োজনে এর সাহায্য নাও এটাও আমি জানি। ইন্টারনেট এ সব সময় বোঝা যায় কি কোনটা সঠিক বানান? না বোধ হয়। এখন তো দেখি কম্পিউটার এর সামান্য বিদ্যে দিয়েই কেউ কেউ অপেক্ষাকৃত কম কম্পিউটার জানা লোকেদের অনায়াসে কেমন বিদ্রুপ আর তাচ্ছিল্য করে। এমন ভাবে ব্যঙ্গ করে মুচকি হাসি হাসে যেন, ''বিদ্যে বোঝাই বাবুমশাই''...পারলে নিজেদের বিল গেটস এর সমকক্ষ ভাবতে পারলেই স্বস্তি বোধ করেন বোধ হয়। তাঁরা আবার অন্যান্য অনেক বিষয়ে পুরো গোল্লা জ্ঞানী। যাক সে কথা।

তোমাদের নাটকের সাফল্য কামনা করছি। আর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি,ঘরের ছেলে কখন ঘরে ফিরবে। অনেক আদর নিও বাবা।

ইতি,
তোমার ''মা''
২৯/৬/২০২২

সরকার পোষিত কলেজ শিক্ষক, বাংলা বিভাগ

বর্তমান পৃথিবী

প্রিয়াঙ্কা গুপ্ত

অজানা এই পৃথিবীতে
সবই যেন জানা জানা।
অচেনা এই শহরে
সবই যেন চেনা চেনা।
এখানে যে পথেই যাই
আলো শুধু আর আলো
তবুও জানি না কেন
চারদিক লাগে কালো কালো।
এই আলোময় অন্ধকারে
কারে পাবো খুজিয়া?
যেখানে যাই না কেন
থাকতে হয় মুখ বুজিয়া
নেই আর সবুজ
নেই আর কুঁড়ে ঘর;
এখানে যেন সবাই
আপন থেকেও পর!
এখানে স্ত্রীজাতি যত
পরে থাকুক ঘোমটা
তবুও চারিদিকে রয়েছে
বিপদেরই ঘনঘটা।
তা নাহলে হতনা
এই কান্ড নির্ভয়ার
সামান্য প্রতিবাদের ফলে
এটা ঘটে বারম্বার।
এটা রুখতে সচেষ্ট হয়ে
দাঁড়ায় না কেহ
তাই ছিন্নভিন্ন পাওয়া যায়
সেই মেয়েটির মৃতদেহ।
ছিল কি দোষ তার?
চেয়েছিল আত্মপদনির্ভর হতে।
তাই বুঝি নিম্ন মানসিকতা
দিল না তাকে বেঁচে থাকতে।

চতুর্থ অর্ধবর্ষ, ইতিহাস বিভাগ

Truthfulness

Ranjan Kumar Auddy

Dasharath, the king of Ayodhya, once went to a forest to hunt. Leaving his companions behind, he went deep into the jungle all alone. It was growing dark but he could not find a game. Suddenly, he heard the lapping sound of water and guessed that a water-body exists nearby and a deer must have come to quench its thirst. Dasharath knew the art of shooting arrows at an object without seeing it but only following its sound. He shot an arrow at the source of the sound of lapping water. Immediately, to his great shock, he heard the cry of a human being! He realized that he has committed an unintentional murder! He rushed to the spot to find a young boy shot by his arrow; the boy was bleeding profusely and was about to die. The king took the boy in his lap and said, 'Forgive me. I have shot you by mistake. Who are you?' The boy replied that he was Shravankumar, the only son of his parents who would not be able to survive without him. He had come to collect water for his parents. He loved his parents deeply and requested the king to give the pot of water he collected to his parents, who were two blind munis (sages). Then Sharavankumar breathed his last.

King Dasharath was shattered; he knew that the blind sage would curse him severely. But Dasharath was an honest man; he did not want to hide what he had done. Only the silent trees of the forest were witness of the crimehe committed in ignorance;but Dasharath never thought of escaping. He carried the corpse to the blind parents and offered them water. The aged sages were surprised to hear the voice of the king and asked, 'Where is our son Shravankumar'? Bowing his head in deep shame the kingmanaged somehow to confess his deed. The shock was too much for the blind aged couple. Their heart broke apart. They were going to die.

Before they died, the father of Shravankumar cursed Dasharath that as they were going to die of the sorrow of losing their son, the king would also die of the sorrow of losing his son. The mighty king accepted the curse silently.

Dasharath returned home a broken soul. He told Rishi Vashistha all that had taken place. Vashistha replied, 'You should not be so sad O king! Rather you should be happy!' The king looked at the sage with surprise. Rishi Vashistha replied, 'You are an honest person and this curse will prove to be a blessing in disguise. Since you have no son, you will surely become a father of a son; otherwise how will you suffer from the sorrow of losing a son'? Dasharath had no son and he was pleased to know that he would surely have children. In due course, he became the proud and happy father of Rama,

Lakshmana, Bharat and Shatrughna. Thus, truthfulness and courage to acknowledge and confess the truth - lay behind the birth of Shri Rama, who is worshipped as God by millions of people.

Several years later, Dasharath remembered again the curse of the blind parents of Shravankumar when he was on his deathbed. His sons Rama and Lakshmana and daughter-in-law Sita had gone to exile for fourteen years. He could not endure the sorrow of his sons and daughter-in-law going away in exile to forest to fulfil his promise. He died of the sorrow.

[Retold and adapted from Ramayana by Ranjan Kumar Auddy]

Assistant Professor, Department of English

OUR ACHIEVERS

Esha Kumari Shaw, currently in her 6th semester, and Shivang Singh, in his 2nd semester, are both pursuing B.Com at Heramba Chandra College. We are delighted to share the remarkable news that they have been chosen as participants for the highly esteemed Community College Initiative (CCI) Program of 2023. The CCI Program, sponsored by the U.S. Department of State and financially supported by the U.S. Government, offers a prestigious scholarship opportunity. With numerous applicants from India, only 16 students were selected, and we are immensely proud to announce that two of our college's Commerce Department students have achieved this exceptional honour. Our wholehearted congratulations go out to Esha and Shivang for their extraordinary accomplishment.

Congratulations to Krishnanshuk Saha, a student of the 2021-2024 B.Sc. Honours Programme in Geography. He has received the Indo-Korean Talent Scholarship of $ 2500. He is permitted for Government of Korea sponsored all-expense covered up study for postgraduate and Doctoral Programmes at Seoul National University. We extend our heartfelt congratulations to him for this outstanding accomplishment.

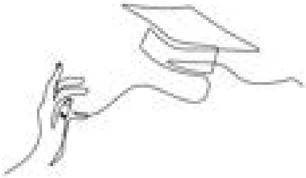

আমার কাছে স্বাধীনতার অর্থ

মেঘা সিং

“স্বাধীনতা”! স্বাধীনতা হল ইংরাজী Liberty শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ। যার অর্থ ৭১৫২ বা স্বাধীন। স্বাধীনতা মানে হলো অপরের অধীনে না থাকা। জীবনে কখনো নিজের আত্মসম্মান বিসর্জন না দেওয়া। অর্থাৎ, স্বাধীনতা বলতে নিজের ইচ্ছামত আচার-আচরণের সুযোগ-সুবিধা কে বোঝায়। স্বাধীনতা হলো এমন একটি শর্ত, যেখানে একটি জাতি, দেশ বা রাষ্ট্র, জনগণ, তাদের নিজস্ব শাসনব্যবস্থা এবং সাধারণত কোন অঞ্চলের সার্বভৌমত্ব থাকবে। বিভিন্ন রাষ্ট্র দার্শনিক স্বাধীনতা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মতামত পোষণ করেছেন। ফরাসী রাষ্ট্র দার্শনিক রুশোর মতে, আইনের প্রতি আনুগত্যই হল স্বাধীনতা। আবার অধ্যাপক লাস্কির মতে, স্বাধীনতা বলতে এমন একটি পরিবেশকে বোঝায় যেখানে মানুষ তার ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারে। তিনি আরো বলেছেন - “Liberty is the product of rice”

‘স্বাধীনতা’ শব্দটির ব্যাপ্তি অনেক। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কতটা স্বাধীন হতে পেরেছি মনে প্রাণে। স্বাধীনতা বলতে আমি শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথা ভাবি না। আমি স্বাধীন দেশেই জন্মেছি। ব্রিটিশদের দ্বারা পরাধীনতার গ্লানি আমি ইতিহাসে পড়েছি কিন্তু তার পরেও একটা প্রশ্ন থেকেই যায় যে প্রকৃত অর্থেই কি আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক?

আমার কাছে স্বাধীনতা বলতে গর্ব ভরে বলতে পারা ‘আমি ভারতবাসী’। আমার কাছে স্বাধীনতা মানে ভয়শূন্য ও আপোষহীন ভাবে বাঁচা। মানবিক আঞ্চ ইনের অনুশাসন মেনে এবং অন্যের স্বাধীনতা খর্ব না করে সম্পূর্ণ নিজের মত বাঁচতে পারাটাই আমার কাছে স্বাধীনতা। যেখানে নিজের পছন্দমত নিজের কাজ করতে পারার সুযোগ থাকবে আর যাতে অন্যদের কোন সমস্যা হবেনা, থাকবেনা কোনো পরাধীনতা, পর নির্ভরশীলতা, মুক্তভাবে চলার পথে থাকবেনা কারো হস্তক্ষেপ।

আমার কাছে স্বাধীনতা মানে নারী পুরুষ নির্বিশেষে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী উপযুক্ত কাজ করতে পারা। চোখের সামনে একজন অসহায় মানুষ দেখলে তার দিকে সাহায্যের হাত কারও অনুমতি ছাড়াই বাড়িয়ে দিতে পারার মধ্যেও আমি স্বাধীনতা খুঁজে পাই। যেখানে বিকৃত মনস্ক মানুষ শিশু কিংবা নারীর ওপরে নির্যাতন চালায়, সেখানে স্বাধীনতা আমাকে প্রতিবাদ করতে শেখায়। সেই প্রতিবাদ কোনও রাজনৈতিক নেতা বা পাড়ার প্রভাবশালী দাদার ভয়ে ভীত নয়। আমার স্বাধীনতার অভিধান জাত-পাতের ভেদাভেদ থেকে মুক্ত।

স্বাধীনতা আমার কাছে মুক্ত আকাশে উড়তে থাকা পাখির মতো। স্বাধীনতা মানে কলেজ ফেরত নির্জন পথ ধরে নির্ভয়ে বাড়ি ফেরা। স্বাধীনতার মানে হলো সত্য কথা বলা, ন্যায়ের পথে সাহসের সঙ্গে লড়াই। স্বাধীনতার অর্থ হলো বাক ও মত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা । আমার মতে, স্বাধীনতা মানে প্রত্যেকের একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও তাদের মতামতের গুরুত্ব দেয়া।

স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নয়। তবে নিজের স্বার্থকে এমনভাবে সর্বোচ্চ পরিমানে চরিতার্থ করা যেটা করতে গিয়ে অন্যের যেন সামান্যতম সমস্যা, ক্ষতি বা অসুবিধা না হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় গান শোনা আমার অধিকারে পড়ে, সেটা আমার স্বাধীনতা। কিন্তু সেই গানের আওয়াজ যদি উচ্চ হয়, গানের কথা বা অর্থ যদি অশ্লীল হয়, আমার চারপাশের মানুষ যদি সেই গান শুনে বিরক্ত বা বিব্রত হয় তখন সেই গান শোনাটা অন্যের স্বাধীনতাকে খর্ব করে। তখন সেই গান শোনা স্বেচ্ছাচারিতা হবে।

ইংরেজ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেনসারের স্বাধীনতার সংজ্ঞা থেকে বোঝা যায় যে, প্রতিটা মানুষের স্বাধীনতা উপভোগের একটা সীমা আছে। সেই সীমা অতিক্রম করলে অন্যের স্বাধীনতা চর্চা ব্যাহত হয়। তাই স্বাধীনতা

সেই সীমা পর্যন্ত উপভোগ করতে হবে যে পর্যন্ত অন্যের স্বাধীনতা ব্যাহত না হয়। নিয়ন্ত্রনহীন স্বাধীনতা অরাজকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি করে। অবাধ স্বাধীনতার অস্তিত্ব কোন সমাজেই থাকতে পারে না।

"স্বাধীনতা মানে স্ব-অধীনতা", অর্থাৎ নিজের অধীনে চলা। স্বাধীনতা বলতে আমি বুঝি নিজের বিবেক আর ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশকে। আমার কিছু বলতে ইচ্ছা করছে, বলে দিলাম। লিখতে ইচ্ছা করছে, লিখে ফেললাম। কিছু করতে ইচ্ছা হয়েছে তো করলাম। বিবেকের কথা উল্লেখ করলাম কারণ সব ইচ্ছাই কিন্ত দেশ ও দশের পক্ষে উপকারী নাও হতে পারে, তাই স্বাধীনতা মানে অবাধ লাগামহীন আচরণ নয়, বরং মার্জিত ও রুচিশীল ব্যবহার।

সবশেষে বলা যায়, আমার কাছে স্বাধীনতা মানে হল এমন একটা স্বপ্ন যেখানে আমরা সবাই সমান পথে চলি,সবাই সবাইকে সম্মান ও সাহায্য করি, কেউ কাউকে হিংসা করি না, সবাই সমাজের মর্যাদা বজায় রাখি, আবার সবাই মিলেমিশে উৎসব অনুষ্ঠান সম্প্রীতির সাথে পালন করে থাকি। দিনশেষে আমি বাধাহীনভাবে নিজেকে প্রকাশ করার মাঝেই খুঁজে পাই আমার স্বাধীনতা। স্বাধীনতা আমাকে নিজের দেশকে ভালোবাসতে শেখায়,দেশের মানুষকে ভালোবাসতে শেখায়।

ষষ্ঠ অর্ধবর্ষ, ইতিহাস বিভাগ

যে সব রাতে স্বপ্ন আসে না

আর্যবীর পোদ্দার

হারিয়ে আর যাচ্ছি বলো কোথায়?
মিশছি খালি পায়ের তলার ধুলোয়।
আমি কেবল কাঁটার পাহাড় বেয়ে,
ফির আসছি নতুন রঙের ফুল হয়ে।

মফস্বলের এ জ্যোৎস্না ভরা রাতে,
ঝরছি আমি শুকনো পাতা হয়ে।
এ শহরের বাতাস অপরিচিত,
আনে না প্রিয় মানুষের ঘ্রান বয়ে।

টুকরো টুকরো মেঘের কোলাকুলি
আকাশ পানে তাকিয়ে দেখি খালি।
তুমি কেমন সরছো প্রতিদিনই,
হাতের মুঠোয় চেপে ধরছি বালি।

আমার আবার ইচ্ছেতে অনীহা,
তুমি তো বেশ শব্দ সাজাও ভালো।
অন্ধকারের বীভৎসতা থেকে,
মুক্তি দেখাক আকাশ ভরা আলে

হিসেব টিসেব মিলতে চায় না আর,
সব কিছুতেই মরচে ধরছে রোজ।
যে পারেনা বলতে নিজের কথা,
সে মানুষকে ভুল বোঝা সহজ।

আমরা কেমন বন্দি হয়ে সবাই,
আটকে থাকি যে যার মতো খাঁচায়।
শোক-দুঃখ দমিয়ে দিয়ে রাতে,
জোনাকিরা বন্ধু হয়ে, বাঁচায়।

চতুর্থ অর্ধবর্ষ, বাণিজ্য বিভাগ

নদীয়ার লোকসংস্কৃতি

সবিতা মণ্ডল

সংস্কৃতি জীবনের সঙ্গে জড়িত—সেই জন্য এর চরম রূপ কোনও এক সময়ে চিরকালের জন্য বলে দেওয়া যেতে পারে না। জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতি ও সভ্যতা গতিশীল। আর গতিশীল বলেই পৃথিবীর প্রতিটি দেশের জাতীয় জীবনে লোকসংস্কৃতি ও তার ইতিবৃত্তের মূল্য এত বেশি, সাধারণত আচার-ব্যবহার, ধ্যান-ধারণা, ধর্মচর্যা, ব্রতকথা, নৃত্য, গীতি, লৌকিক দেবদেবীর কাহিনী, লোকগাথা, লোকব্যুৎপত্তি, স্থাপত্য-ভাস্কর্য, ললিত কলা, মেলা ও উৎসবের মধ্যে দেশের লোকসংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। কিন্তু লোকসংস্কৃতি স্থান-পাত্র ও কালের উপর নির্ভরশীল ও পরিবর্তনশীল। বিশেষত পশ্চিমবাংলার জেলাগুলির লোকসংস্কৃতি। প্রতিটি জেলার কৃষ্টি তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তায় জ্বলজ্বল। অনুরূপ বিচিত্রতার সমৃদ্ধিতে ভরা নদীয়ার লোকসংস্কৃতি।

শিল্প-সংস্কৃতি, শিক্ষা, ধর্মে নদীয়া এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। নদীয়ার অতীত ইতিহাস বাংলার গৌরব কথাই স্মরই করিয়ে দেয়। বর্তমান দিনে প্রাচীন ঐতিহ্যের দীপবর্তিকা আজ অনেকটাই ম্লান তবুও শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মভূমি আর ভারতবর্ষের সংস্কৃত শিক্ষাক্ষেত্র নদীয়ার প্রাণকেন্দ্র নবদ্বীপ। বাংলার শিক্ষা, শিল্প, ধর্ম, সংস্কৃতির কেন্দ্রে আজও এক বিশিষ্ট স্থানে রয়েছে। শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মভূমি নবদ্বীপ। আবার বাসুদেব সার্বভৌম ন্যায়-দর্শনের চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করেছেন। পূর্ণানন্দ মন্ত্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। তন্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা প্রতিরোধ করার জন্য পণ্ডিত কৃষ্ণানন্দ আগম বাগীশ 'তন্ত্রসার' লিখে প্রকৃত সত্য কি তার সন্ধান দেন। বর্তমানকালে আগমবাগীশ গুলায় (শান্তিপুর) যে কালীমায়ের পূজা হয় তারও স্রষ্টা তিনি।

নদীয়া নাম সৃষ্টি হয়েছে নবদ্বীপ হতে। নদীয়া নামের উৎপত্তি নিয়ে অন্য বিভিন্ন মত আছে। ন'টা দ্বীপ নিয়ে গঠিত বলে নবদ্বীপ অথবা ন'টি দিয়া বা প্রদীপ থেকে নদীয়া নামের উৎপত্তি হতে পারে। নদীয়া হতেই একদিন জ্ঞানের দীপবর্তিকার আলো সমগ্র দেশকে আলোকিত করে। নবদ্বীপ শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্র। সেখানকার টোলগুলিতে স্মৃতি, ন্যায়, জ্যোতিষ, তন্ত্রশাস্ত্রে শিক্ষার জন্য বাংলার বাইরে থেকেও প্রচুর ছাত্র সমাগম হত। তৎকালে সমগ্র ভারতবর্ষে এইসব টোলের খ্যাতি ছিল। বিশেষ করে স্মৃতিও ন্যায় শাস্ত্রের জন্য। রাজা রুদ্রের কালে ১৬৮০ খ্রীঃ এইসব টোলগুলিতে চার হাজারের মত ছাত্রসংখ্যা ছিল। ১৭৯১-এ ছাত্রসংখ্যা দাঁড়ায় ১১০০, অধ্যাপক ১৫০। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নবদ্বীপে জন্ম নিয়ে এক নবধর্মের ধারার সূত্রপাতই করেন নি, সর্বভারতীয় পণ্ডিতদের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি তিনিই লাভ করেছেন।

কলকাতা সৃষ্টির আগে কৃষ্ণনগর নদীয়ার রাজধানী ছিল। এমনকি বাংলাদেশের সর্বপ্রধান স্থান ছিল। সর্বপ্রকার শিষ্টাচার সভ্যতার উৎপত্তিস্থল এই নদীয়া। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কৃষ্ণনগর দক্ষিণ বঙ্গের রাজধানী ছিল। সভ্যতা, শিষ্টাচারের উৎস কৃষ্ণনগরের রাজপরিবার। রাজা ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র রায়। বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় যেমন কালিদাস তেমনি কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা না থাকলে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'ও পেতাম না। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় নদীয়ার খ্যাতি প্রসিদ্ধি বেশি ছিল। কৃষ্ণনগর নামের উৎপত্তি শ্রীকৃষ্ণ থেকে। নামকরণ করেছিলেন মহারাজা রুদ্র রায়। এর আগে নাম ছিল রেউই। কথাতে আছে 'কৃষ্ণের নামে কৃষ্ণনগর' অন্য নামে নয়।

পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রজ্ঞান, পুঁথির জ্ঞান ছাড়াও নদীয়ার বাউল গান বিখ্যাত। বাউলদের গানের মধ্যে ধর্মের মূলকথা সহজভাবে পাওয়া যায়। তাঁদের মতে ঈশ্বরের রাজ্যে সবাই একজাতি ধর্মের কোন পার্থক্য নেই। ঈশ্বর লাভ করতে গেলে চায় শুধু ভক্তি। নদীয়াতেও

প্রাচীনকাল থেকে বাউল গান প্রচলিত ছিল। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য নিজেই বাউল শ্রেষ্ঠ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলা হচ্ছে—

"বাউলকে কহিয়ে লোকে হৈল আউল।
বাউলকে কহিয় হাটে না বিকায় চাউল।।
বাউলকে কহিয় কাষে নাহিত আউল।
বাউলকে কহিয় ইহা কহিয়াছে বাউল।।"

বাউল প্রসঙ্গে আমাদের প্রথমেই মনে আসে লালন ফকিরের কথা। নদীয়া জেলার কুমারখালি থানার অন্তর্গত ভাঁড়ারা গ্রামে এক কায়স্থ পরিবারে লালনের জন্ম হয়। নাম ছিল লালনচন্দ্র রায়। আশ্চর্য মানসিকতা তাঁর। ছোট থেকেই ধর্মপ্রবণ মানুষ। বহু দেশ বিদেশ ঘুরে হিন্দু মুসলমান শাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেন। শেষে নদীয়ার হরিনায়াণপুর গ্রামে সিরাজ সাঁই-এর কাছে শিক্ষালাভ করে সাধনা করেন। তিনি প্রথাগত শিক্ষা বিশেষ পান নি। তবে তার রচিত গানগুলি এক সহজ সরল জীবনের দিক নির্দেশ করে। তাঁর খুব উল্লেখ যোগ্য গান—

"(আমার) বাড়ীর কাছে আরশিনগর
এক পড়শী বসত করে
আমি একদিনও না দেখলাম তারে।"

এছাড়া নদীয়া জেলায় কয়েকজন বিখ্যাত বাউল আছেন। কুষ্ঠিয়ার পাঁচু ফকির, শিবপুর ঘোষপাড়ার আউল চাঁদ, ফিকিরচাঁদ, দীন বাউল, গোঁসাই গোবিন্দ, দ্বিজ রমানাথের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লালন ঊনবিংশ শতাব্দীর মানুষ। তাঁর শিষ্যরা আজও গ্রাম বাংলায় লালনের গান গেয়ে গেয়ে বেড়ান।—'সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে' তার অনাদৃত মুখে গানের পরিবর্তন হয়ে যায়। কবি রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায় শিক্ষিত সমাজে বাউল গানের আলোচনা শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথের "শিলাইদহের কোন এক ডাকহরকরা-গগনের নাম জানতে পারি তাঁরই লেখার মধ্যে। এই গগন ফকির লালনের শিষ্যধারার একজন। গগনের গান—"আমার মনের মানুষ সে যে/আমি কোথায় পাব তারে।।" এছাড়া গোসাঁই গোপালের গান তত্ত্ব ও সাধন পদ্ধতির দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। নবদ্বীপের বাউল মোহন্ত চন্ডীদাস, কৃষ্ণনগরের শালিগরাম গ্রামে এক উদাসীন সাধক সম্প্রদায় প্রবর্তিত সাহেবধনী সম্প্রদায় দেখা যায়। এঁরা বাউল বিগ্রহ মানে না, জাত মানে না। এঁদের কাছে গুরুই প্রধান।

নদীয়ার কল্যাণীর প্রাচীন গ্রাম ঘোষপাড়ার এক বাউল সম্প্রদায় আছেন, এঁদের কর্তাভজার দল বলা হয়। আউলচাঁদ এঁদের আদি গুরু। তিনি ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে চাকদা থেকে ছয় মাইল দূরে পশ্চিমে গরবী গ্রামে আবির্ভূত হন। তাঁর ২২ জন শিষ্যর মধ্যে রামশরণ পালই প্রধান। পরে তিনি গুরুপদ পান। রামশরণের স্ত্রীকে 'সতীমা' নামে অভিহিত করেন তাঁর শিষ্যরা। তাঁর সমাধিমন্দির পবিত্র তীর্থস্থান। প্রতি দোল পূর্ণিমার দিন বিরাট মেলা আজও বসে। জয়দেবের কেঁদুলির মেলার মতো বহু শিষ্য, শিষ্যা, আউল-বাউলের সমাবেশ ঘটে।

বাংলার অন্যান্য জায়গার মতো নদীয়াতেও অসংখ্য ছড়া পাঁচালী ছড়িয়ে আছে। এইসব ছড়া, পাঁচালী গ্রামজীবনে শহুরে শিক্ষিত অশিক্ষিত মনে রেখাপাত করে। প্রচলিত ছড়া–

'কাঙাল বাঙাল খাদ্যে তিন নিয়ে নদ্যে।'
বাঁশ বাকস ডোবা, তিন নদের শোভা।'
অথবা, 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান
শিব ঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যা দান।'

নদীয়া নদীপ্রধান। তাছাড়া সেকালে খাল বিলে বারো জলে ভরে থাকত মনে হয় সে কারণ এই ছড়ার প্রচলন হয়েছিল।

জলা বীরনগর সেকালের একটি প্রসিদ্ধ জনপদ। অন্য জায়গার মানুষ সহজ অবস্থায় যা করতে পারত না, জলার লোকে তা অনায়াসে করে ফেলত। সেকালে পাগলের কথা উঠলেই জলার সঙ্গে তুলনা কর। 'উলুই পাতাল', 'উলুই চন্ডী' বলে একটা প্রবাদেরও প্রচলন ছিল। "উলোর পাগল গুপ্তিপাড়ার বাঁদর, হালিশহরের ত্যাঁদর।" উলো বীরনগরকে নিয়ে আর একটি ছড়া—

'উলোর কুলুজি, অগ্রদ্বীপের খোঁপা।
শান্তিপুরের হাতনাড়া, গুপ্তিপাড়ার চোপা।'

নদীয়ার প্রাচীন গ্রাম শান্তিপুরের নিকটেই দিগনগর। দীঘি হতে দিগনগর নাম। রাজা রাঘব এ দীঘি খনন করে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। কবিগুরুর সংগ্রহে দিগনগর সম্বন্ধে একটি ছড়ার উল্লেখ আছে—"আজ পুবলের অধিবাস, কাল সুবলের বিয়ে।/সুবলকে নিয়ে যাব আমি দিগনগর দিয়ে"/দিগনগরের মেয়েগুলি নাইতে নেমেছে।/চিকণ চিকণ চুলগুলি ঝাড়তে লেগেছে।।/ পরণে তার ডুরে শাড়ী খুয়ে পড়েছে।/দুইদিকে দুই রুই কাতলা ভেসে উঠেছে।।

কবি রবীন্দ্রনাথ একবার কোন সামাজিক কাজে দিগ্‌নগরে আসেন, রবীন্দ্রনাথের বড় বোন সৌদামিনীর সঙ্গে দিগনগরের যাদবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের ছেলে

সারদাপ্রসাদের বিয়ে হয়। মোটর লঞ্চে শান্তিপুর, সেখান হতে ঘোড়ার গাড়িতে দিগনগরে সারাদিন খাওয়া দাওয়া করে ফিরে যান। রবীন্দ্রস্মৃতি বিজড়িত সেই বাড়ি হস্তান্তরিত হয়ে অন্যের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়ে গিয়েছে।

শিলাইদহের কবি রবীন্দ্রনাথের উপর নদীয়ার দাবী যথেষ্ট। নদীয়ার এক প্রান্তে বসে কবিতা, নদীয়ার ছড়া, ইতিকথা সংগ্রহ করেছেন। ইন্দিরা দেবীর লেখা 'রবীন্দ্রস্মৃতি' থেকে জানা যায় কৃষ্ণনগরে কবি কয়েকবার এসেছেন। কৃষ্ণনগরে রামতনু লাহিড়ীর ছেলে সত্য লাহিড়ীকে কেন্দ্র করে এক উচ্চাঙ্গ গানের আসর ছিল। সেখানে প্রথম চৌধুরী গান গাইতে বলায় কবি গান গান। কৃষ্ণনগরে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখা দিলে কৃষ্ণনগর ছেড়ে অনেকেই খাড় নদীর ধারে নতুনভাবে বসতি স্থাপন করে। এখন এই অঞ্চলের নাম জোয়াড়ী, প্রচলিত ছিল—

''গোঁপ ফোঁপ পেট ডাগর এই তিন নিয়ে কেষ্টনগর।

গাড়ী ঘোড়া শোয়াড়ী এই তিন নিয়ে গোয়াড়ী।।''

নদীর ধারে নতুন শহর গোয়াড়ী গড়ে উঠলে তার নাম হলো নগেন্দ্রনগর। নদীর ধারে প্রায়ই জলে ডুবে গেলে মিছিলে গাওয়া হ'ত—'ঐ নগেন্দ্রনগর বাসর সাগর হাবুডুবু খায়।'

মহাকবি কৃত্তিবাস ফুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'শ্রীরাম পাঁচালী' রচনা করেন। কৃষ্ণনগরে বহু কবি পাঁচালী গায়ক ছিলেন। তাঁদের লেখা গান, পাঁচালী আজ অবলুপ্ত। মিছিলের গানের লেখক তারাপদ রায়ের 'শতদল' ছাড়া আজ আর তাঁর কোন লেখাই পাওয়া যায় না। কৃষ্ণনগরের করদোল খেলা নিয়ে বহু লেখা রচিত হয়েছে। কৃষ্ণনগরের পাঁচালী গায়ক বেণী মল্লিকের নাম আজ লুপ্ত।

নদীয়ার এক প্রাচীন গ্রাম নাকাশীপাড়া। এখানকার ব্রাহ্মণীতলায় প্রতি বৎসর শ্রাবণ সংক্রান্তির দিন পুজো ও মেলায় জনসমাগম হয়। এখানকার জমিদার বাড়িতে উৎসব উপলক্ষ্যে যাত্রা, কবিগান, পাঁচালী গান হতো। পাঁচালীকার প্রতি বৎসর পারিশ্রমিক ১৮০ করে পেলেও সেবার ৮০ টাকা পান। তিনি সেকথা বাঁধেন পাঁচালীতে—''গ্রামে নাম নাকাশী/আগে পেতাম একশো আশি/এবার পেলাম শুধু আশি/আসছে বার আমি কি না আসি।'' পাঁচালীকার দাশরথি রায় মতান্তরে, গোবিন্দ অধিকারী। নবদ্বীপের পণ্ডিতরাও দাশু রায়ের পাঁচালী গান উপভোগ করতেন।

একসময় গোটা বাংলাদেশে ভোলা ময়রা আর এ্যান্টনী ফিরিঙ্গির নাম কবিয়াল বলে ছড়িয়ে পড়েছিল। গুপ্তিপাড়ায় ভোলা ময়রার জন্ম। নাম ভোলানাথ নায়ক। একবার কাশিম বাজার রাজবাড়িতে কোথাকার কী ভোলা ময়রাকে বলতে বলা হয়েছিল উত্তরে বলেছেন—

'রায়ের রাঁধুনী বামুন; বর্দ্দিদের পৈতে।
নদীয়ার নবীন নাগর; কে পাবে গো সইতে?
কৃষ্ণনগরের ময়রা ভাল, মালদহের ভাল আম।
উলার ভাল বাঁদর পুরুষ, মুর্শিদাবাদের জাম।।'
শান্তিপুরের শালী ভাল, ভালো তার খোঁপা।
গুপ্তিপাড়ার গিন্নি ভাল, ভাল তার চোপা।।'

ভারতচন্দ্রের কথা না বললে নদীয়ার সংস্কৃতির কথা সম্পূর্ণ হবে না। তাঁর কাব্যে ছড়া, সত্যপীরের কথা ধর্মসঙ্গীত, অশ্লীল ভাষা সবই আছে। বাংলা, হিন্দি, পার্সি, সংস্কৃত ভাষায় কবিতা লিখতে পারতেন। কৃষ্ণনগরের 'বিষ্ণুমহলে' বসে রায়গুণাকার অন্নদামঙ্গল কাব্য, কবিতা, ছড়া, পাঁচালী রচনা করে বাংলা সাহিত্যকে সম্পদশালী করেছেন। কৃষ্ণনগর মহারাজের সভাকবি সাধক রামপ্রসাদের সাধন সঙ্গীত বাংলা সাহিত্যের শুধু মূল্যবান সম্পদ নয়, সঙ্গীতের সুরের নূতন প্রবর্তক। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রামতনু লাহিড়ী, দীনবন্ধু মিত্র, জলধর সেন, কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী এঁরা সকলে শুধুমাত্র নদীয়ার মাটিতে জন্ম নেননি—বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করেছেন। নাকাশী পাড়ার বিল্বগ্রামে মদনমোহন তর্কালঙ্কার ১৮১৭ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন। 'বাসবদত্তা'র কবিকে আমরা ভুলতে পারি না। তিনি স্ত্রী শিক্ষার প্রসারেও অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর লেখা শিশুসাহিত্য অমূল্য সম্পদ—

'পাখীসব করে রব রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল
রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে।
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে।।'

নদীয়াকে দক্ষিণ ভারতের মত মন্দিরময় বলা যায়। এইসব মন্দিরের বেশিরভাগ দোচালা, চারচালা গড়নের ইঁটের বোস্তলী মন্দির। প্রথমেই শিবনিবাসের কথা আসে। শিবনিবাসকে কাশীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে—'ইশব নিবাস তুল্য কাশী ধন্য নদী কঙ্কনা/ উপরে বাজে দেব ঘড়ি, নীচে বাজে ঠঁঠনা।' এখানে ১০৮টি শিব মন্দির আছে। এখানকার পুরনো রাজবাড়ি পথিক, স্থাপত্যের সুন্দর নিদর্শন। দিগনগরের রাঘবেশ্বর

মন্দির রাজা রাঘব প্রতিষ্ঠা করেন। রাগআঁচড়া গ্রামে চাঁদ রায় প্রতিষ্ঠিত মন্দির বন দেবীর, তেহট্টের কৃষ্ণ রায়ের মন্দিরে টেরাকোটার কাজ করা আছে। বীরনগরের জোড় বাংলার মন্দিরের গায়ে টেরাকোটার কাজ অপূর্ব নিদর্শন। আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী'-তে বা মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চন্ডীমঙ্গল'-এ উলার নাম পাওয়া যায়। শান্তিপুরের জলেশ্বর মন্দির ও শ্যামচাঁদ-এর মন্দিরের টেরাকোটার কাজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সময় থেকেই মৃৎশিল্পের সূচনা। মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতায় নাটোর হতে কয়েকজন কৃষ্ণনগরে এসে বসবাস করেন। হাঁড়ি, কলসি তৈরি করতেন প্রথমে, পরে রাজার আদেশে দেবীমূর্তি তৈরি করেন। ছুটু পাল প্রথম বড়ভূজ মূর্তি তৈরি করেন। তাতে শুধু রাজা নয় দেশের মানুষও খুশি হলো। মোহন পাল প্রথম নাম করেন। কৃষ্ণনগরের একপ্রান্তে ঘূর্ণি নামক এলাকায় এঁদের বসবাস। আজকাল এঁরা ভাস্করের কাজেও যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন।

এরপরেই আসে শান্তিপুরের তাঁতশিল্প। কাঁসাপিতল, সোনার কাজ, ডাকের সাজ, শঙ্খশিল্প উল্লেখযোগ্য। শান্তিপুরের তাঁত শিল্পে বহু লোক জীবিকা নির্বাহ করছে। সেকালে সূদ ধুতি শাড়ি শান্তিপুরে হতো, হাত না দিলে বোঝা যেত না। এখানে একদা মসলিন শাড়িও প্রস্তুত হতো। শাড়ির পাড়ে ছড়ার গান, দেশাত্মবোধক গান তুলে অভিনবত্ব সৃষ্টি করতেন। দেশ বিভাগের পর টাঙ্গাইলের বিখ্যাত তাঁত শিল্পীরা এসে শান্তিপুর ও আশেপাশে ভিড় করেছে।

নবদ্বীপ, বাহিরগাছি, খোটয়ারী, ধর্মদা-য় এখনও কাঁসা পিতলের কাজ হয়। মেটিয়ারীতে হ্যাচাক, স্টোভ তৈরী হয়। ডাকের সাজ আজ অবলুপ্তির পথে। কৃষ্ণনগরের ডাকের সাজের যথেষ্ট সুনাম আছে। কালীগঞ্জের শোলা শিল্প একদা দেশের বাইরেও যেত। নবদ্বীপে শাঁখা শিল্পর প্রচলন ছিল। বেলেডাঙ্গা অঞ্চলে এখনও অনেক শঙ্খ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত আছেন।

চাকদার চিরুণী ও বোতাম শিল্প নদীয়ার শিল্পক্ষেত্রে সমৃদ্ধি এনেছে। এছাড়া বাঁশ ও বেতের কাজও বিখ্যাত। নদীয়ায় আল্পনা শিল্প, পল্লী অঞ্চলে কাঁথার উপর নকশা এক সুন্দর শিল্প। গাজনের বোলান গান, রায়বেশে পল্লী অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। এই রায়বেশে খেলায় লাঠি খেলা অপরিহার্য ছিল। জোড়া চাকা নিয়ে, ঢেঁকী নিয়ে, কাঁধে পিঠে, বুকে মানুষ নিয়ে খেলা দেখানো হ'ত। শান্তিপুরে আশানন্দ মুখোপাধ্যায় যাঁকে আশানন্দ ঢেঁকি বলা হয়—তিনি ঢেঁকি ঘুরিয়ে দুষ্টদের দমন করেছিলেন। বহু নাম করা ঢুলি, ঢাকি ছিল যাদের অস্তিত্ব প্রায় লোপ পেয়েছে।

মানুষের রুচির পরিবর্তন এবং অর্থনৈতিক চিন্তায় অন্যান্য দেশের মত নদীয়ার সূদ কুটির শিল্প লোপ পেতে চলেছে। শিল্পীরাও শিল্পসাধনা ছেড়ে বৃত্তি পরিবর্তন করেছে। তাই প্রাচীন মন্দির ভাস্কর্য, কারুকার্য সংস্কার সম্ভব হচ্ছে না। সূদ শিল্প লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

সরকার পোষিত কলেজ শিক্ষক, বাংলা বিভাগ

বৃষ্টি

অন্বেষা রায়

বৃষ্টি তুমি করো মনে
আকাশ তোমার বাসস্থান
মেঘ করলে আকাশে তবে
সংসার হয় তোমার স্থান।

বৃষ্টি হয়তো তোমার অজানা
ছোটোদের তুমি দাও অনেক খুশি
কিন্তু অনবরত এলে তুমি
সংসার হয় অতি দুঃখী।

বৃষ্টি তুমি অতি সুন্দর
থামিয়ে নিজের গতিকে
সাতরঙা রামধনু দেখাও
এই বিশ্ব সংসারকে।

বৃষ্টি তুমি করো মনে
তুমি শুধুই পড়ো ঝড়ে
আকাশপ্রাণ দিয়ে
বৃষ্টি হয়তো তোমার অজানা
শত কোটি মানুষ
হৃদয় দুখিয়ে তোমারে ঝড়ায়
নিজের অশ্রু দিয়ে।

দ্বিতীয় অর্ধবর্ষ, বাংলা বিভাগ

Beauty of a Normal Life

Anushka Bardhan

An exceptional life
Something out of the ordinary
You've been living every single day
Craving to be someone luminary.

Did they make you believe
That you need to "live your best life"?
And if not, and if you live like YOU
You'll drown in a vicious strife?

You try and outdo yourself
Or else you won't leave a mark
You gain nothing but heaviness from it all
Allowing yourself to listen to them bark.

You want something that can only be imagined
Letting your precious present slip,
You spend days wondering how to stand out
Wondering how to escape this guilt trip

Oh but your happiness doesn't come from a car, a house, a sizable income.
Living your best life isn't always about circumstances
Not when you can be yourself in an ordinary world
A world where you take your own chances

So don't let them.
Don't let them give you decrees,
Don't let them have dominion,
Don't let them sway you and,
Don't let them rule your opinion,
For it's perfectly okay.
If living your best life is waking up;
To a beautiful and sunny morning
To enjoy your tea in a ceramic cup,
To live without anyone's scorning

If living your best life is taking a walk,
A quiet peaceful walk through the park
Or if it's always loving the little things
Loving the little details that give you a spark.

If living the best life is singing along to your favourite songs
Or coming back home to your fluffy dog,
If it's watching a new series or movie
Or reading an inspirational blog.

And so what if you live a normal life?
So what if you have a few friends?
So what if you're clumsy in your job at times?
And maybe sometimes struggle to meet ends?

Who says a good life has to be exceptional?
You choose your own ways & according results you get
So please end existing their way
For living an exceptional life is all about the mindset.

2nd Semester, Department of English

Ghost Rider

Lily Law

It was the early years of my travel when I was travelling a lot near and around the town of Raiganj, in North Bengal. I used to travel from Raiganj to Purnea and visit places like Rajgir and Pawapuri. Well, in that case I had to change vehicle at Purnea and take another bus to Raiganj.

Something very strange happened in one of these journeys back from Purnea to Raiganj. It was the month of December and extremely cold in those parts. When I got down at Purnea to take the next bus to Raiganj it was nearly midnight and I came to know that there would be no more buses plying that night due to a bus strike. This was bad news indeed as there was no good hotel nearby to put up for the night!

I was travelling with my mother and husband and we decided to hire a cab to Raiganj instead of spending the night unprotected in Purnea. It was cold and dark, and suddenly we noticed a car standing near the dhaba where we had taken some food. After a quick talk with the driver we three huddled into the cab and an incredible and mysterious journey began!

Tired by the previous journey and shivering in the cold, my eyes closed in exhaustion and I dozed off. I really have no idea how long I slept before my eyes opened into a pitch, black darkness around me! It was extremely cold and so dark that it would be difficult to recognise the people around me had I not known them so well! The cab was moving at break-neck speed, almost flying at least a feet or two above ground and the driver seemed to have turned into a ghostly silhouette! I tried to speculate on his features in the front mirror but he actually seemed to have none! Was he just a ghost rider with no possible human features? Just sunken holes instead of eyes and angular, fleshless cheek bones like an upright skeleton? No ! I wanted to shout to stop the literally flying vehicle travelling into the unknown darkness all around! But no sound came from my throat. Helpless I used my hands to warn my mother and husband. But they also seemed to have turned to stone or were they also too scared to speak? It was an extremely fearful situation and the journey seemed never to end!

It was only the early light of morning that eased my fears especially when I recognised a few places which led to Raiganj. I couldn't believe l was alive and whole when ultimately my journey came to an end near Mohanbati, Raiganj and I saw my husband paying off the driver. I tried hard still to get a last glimpse of the driver's face but he didn't ever turn his head. And trust me readers to this day l do believe he actually had none!

Associate Professor, Department of English

সুদেষ্ণা বসু, সরকার পোষিত কলেজ শিক্ষক, ইংরেজি বিভাগ

শুভ্রজিত রায়, সহকারী অধ্যাপক, গণিত বিভাগ

শুভ্রজিত রায়, সহকারী অধ্যাপক, গণিত বিভাগ

রুদ্রাদিত্য লাহিড়ী, চতুর্থ অর্ধবর্ষ, ভূগোল বিভাগ

রাহুল কুমার দাস, তৃতীয় অর্ধবর্ষ, বাণিজ্য বিভাগ

সৌমলনী মণ্ডল, ষষ্ঠ অর্ধবর্ষ, বাণিজ্য বিভাগ

সব্যসাচী নস্কর, পঞ্চম অর্ধবর্ষ, বাণিজ্য বিভাগ

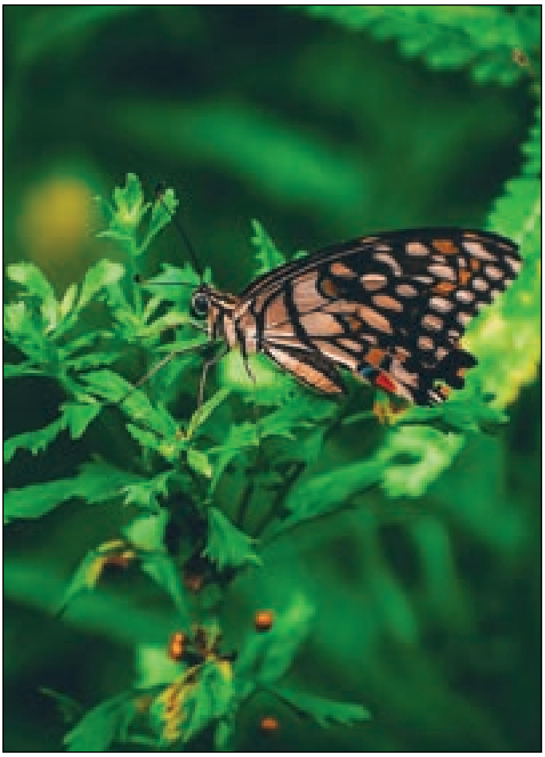

সোহম দলপতি, চতুর্থ অর্ধবর্ষ , বাণিজ্য বিভাগ

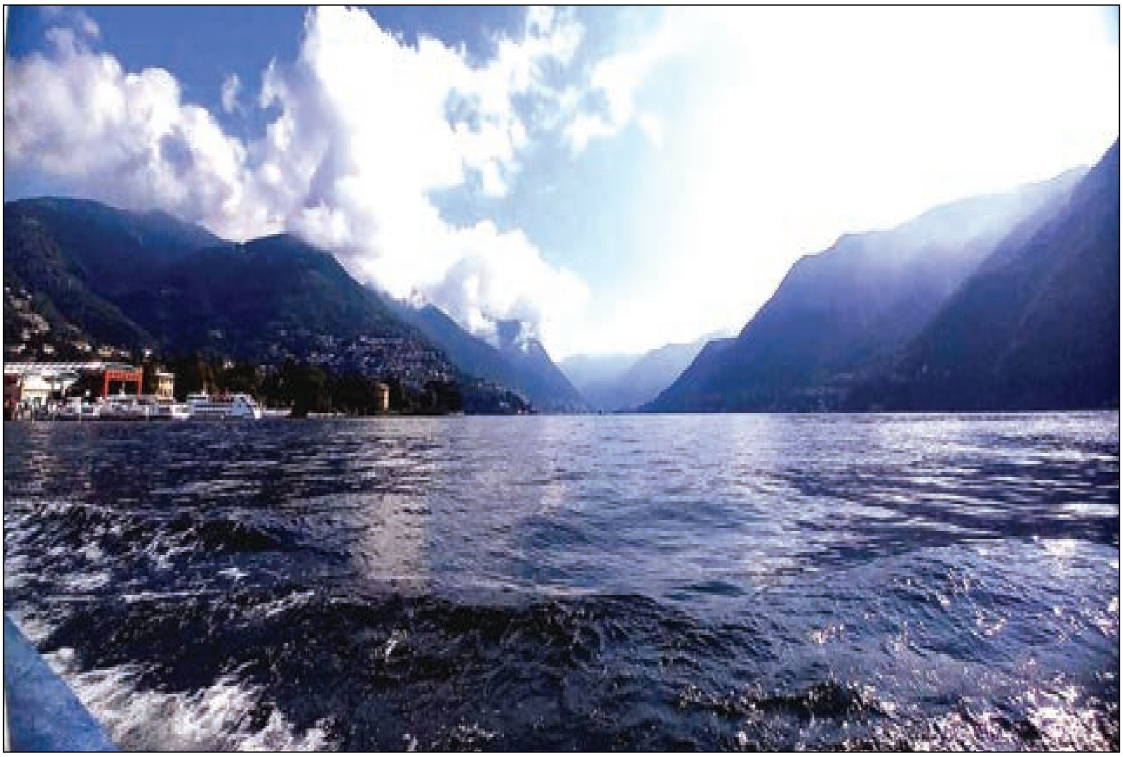

লোপামুদ্রা বসু, সহকারী অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ

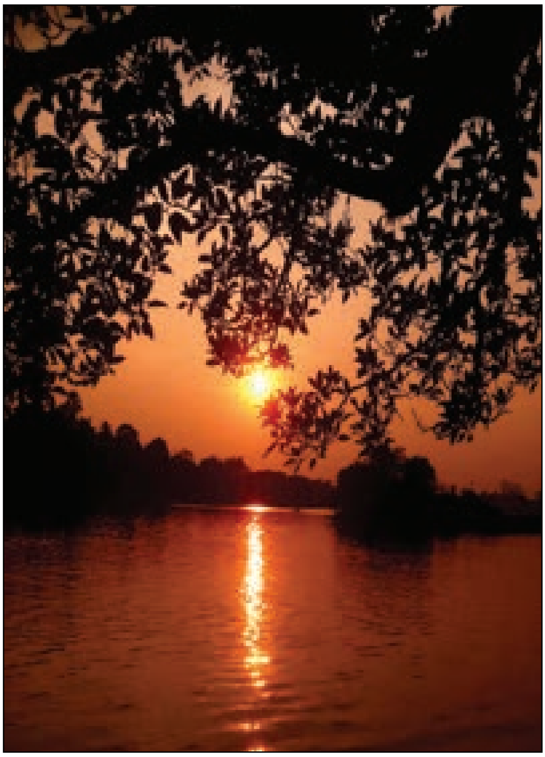

অর্কজ্যোতি সেনগুপ্ত, ষষ্ঠ অর্ধবর্ষ, ভূগোল বিভাগ

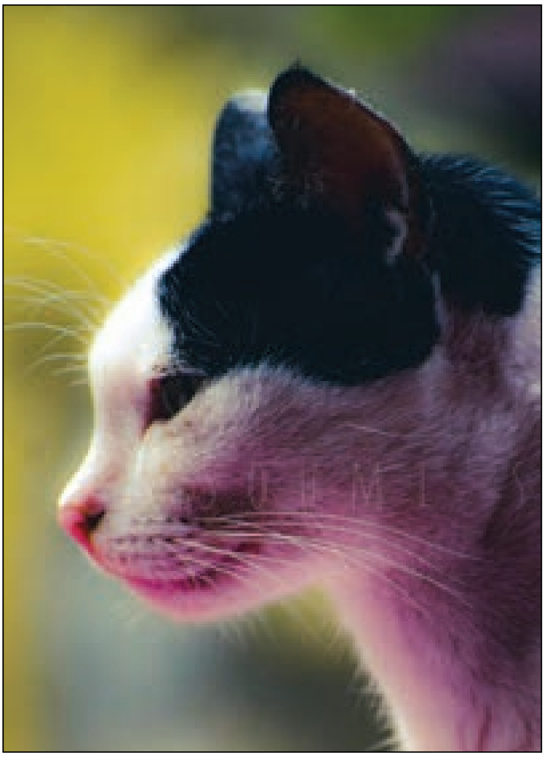

সৌমী জানা, চতুর্থ অর্ধবর্ষ, ইংরেজি বিভাগ

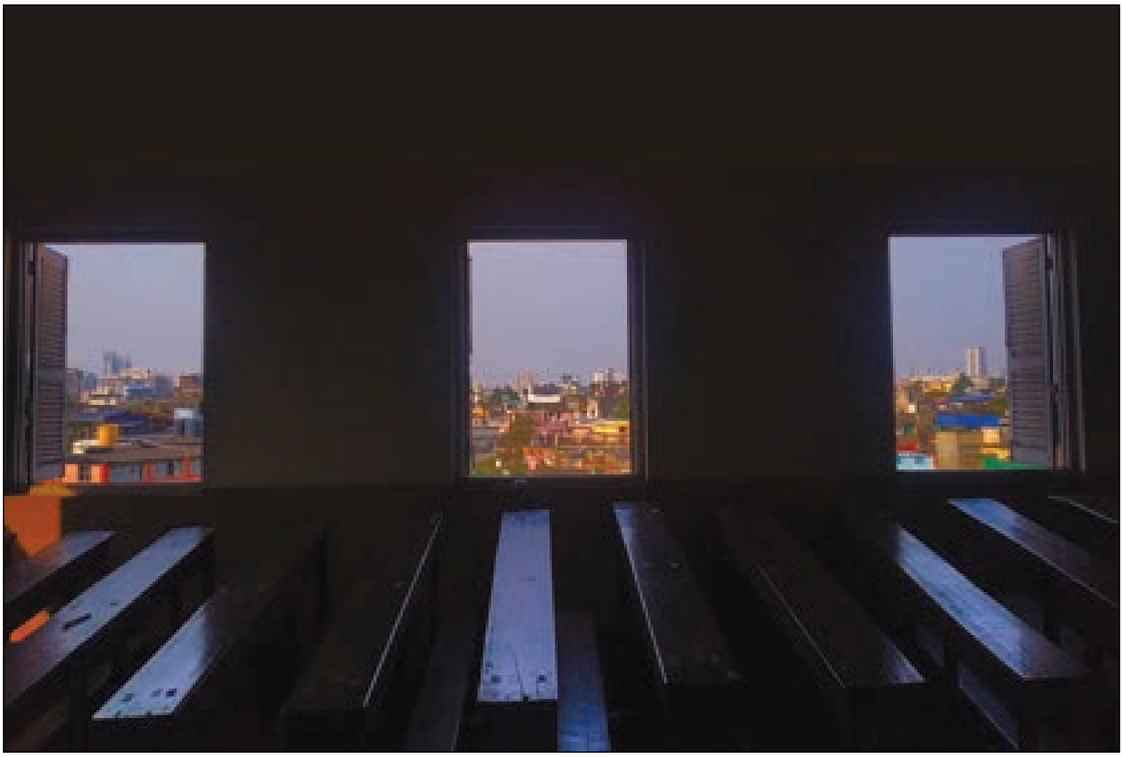

সায়ন হালদার, ষষ্ঠ অর্ধবর্ষ, বাণিজ্য বিভাগ

পৌলমী দাস, পঞ্চম অর্ধবর্ষ, ইতিহাস বিভাগ

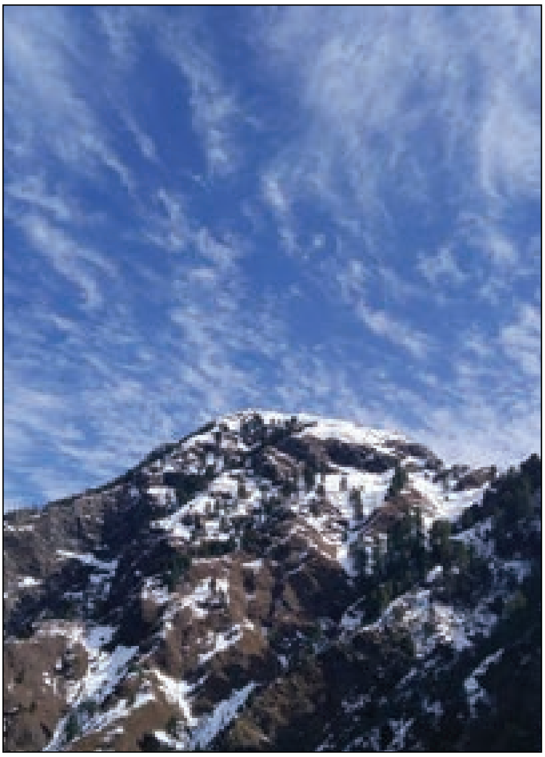

আয়ুষ কিশোর গুপ্ত, দ্বিতীয় অর্ধবর্ষ , রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

নবনীতা চক্রবর্তী, অধ্যক্ষ, হেরম্বচন্দ্র কলেজ

নবনীতা চক্রবর্তী, অধ্যক্ষ, হেরম্বচন্দ্র কলেজ

মধুবন্তী সোম, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

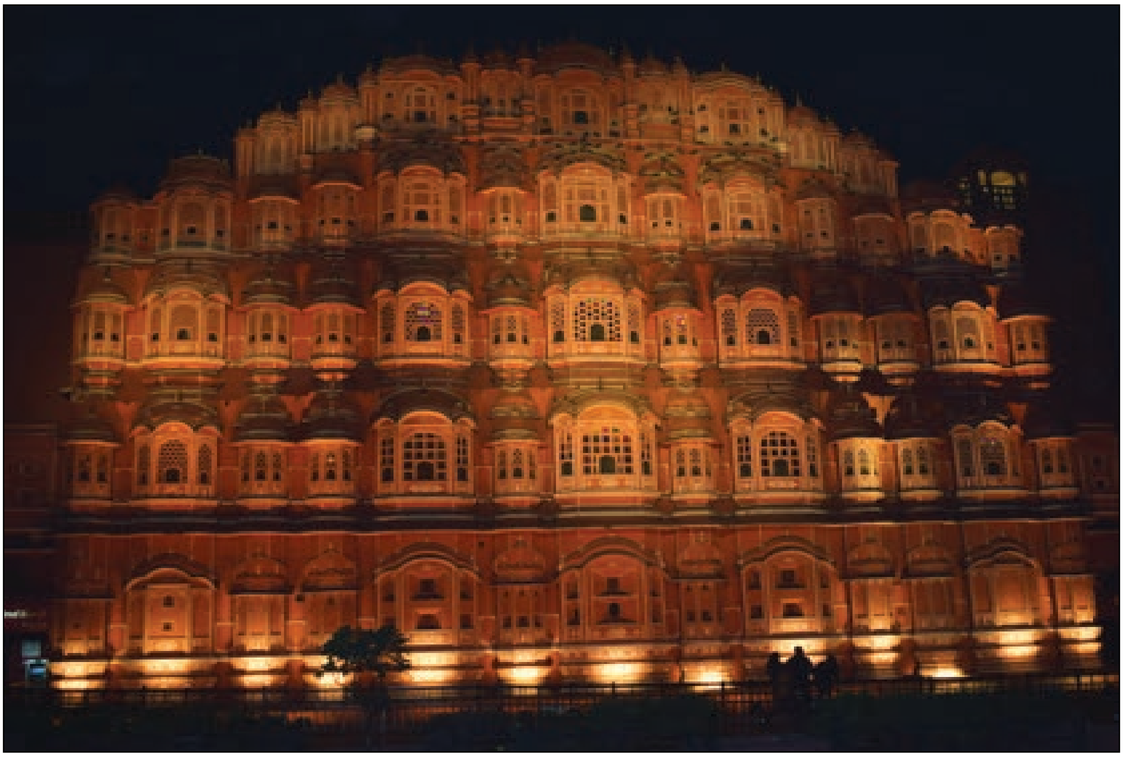

ইমন বাগচী, সহকারী অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ

পৃথা দাস, চতুর্থ অর্ধবর্ষ, ইংরেজি বিভাগ

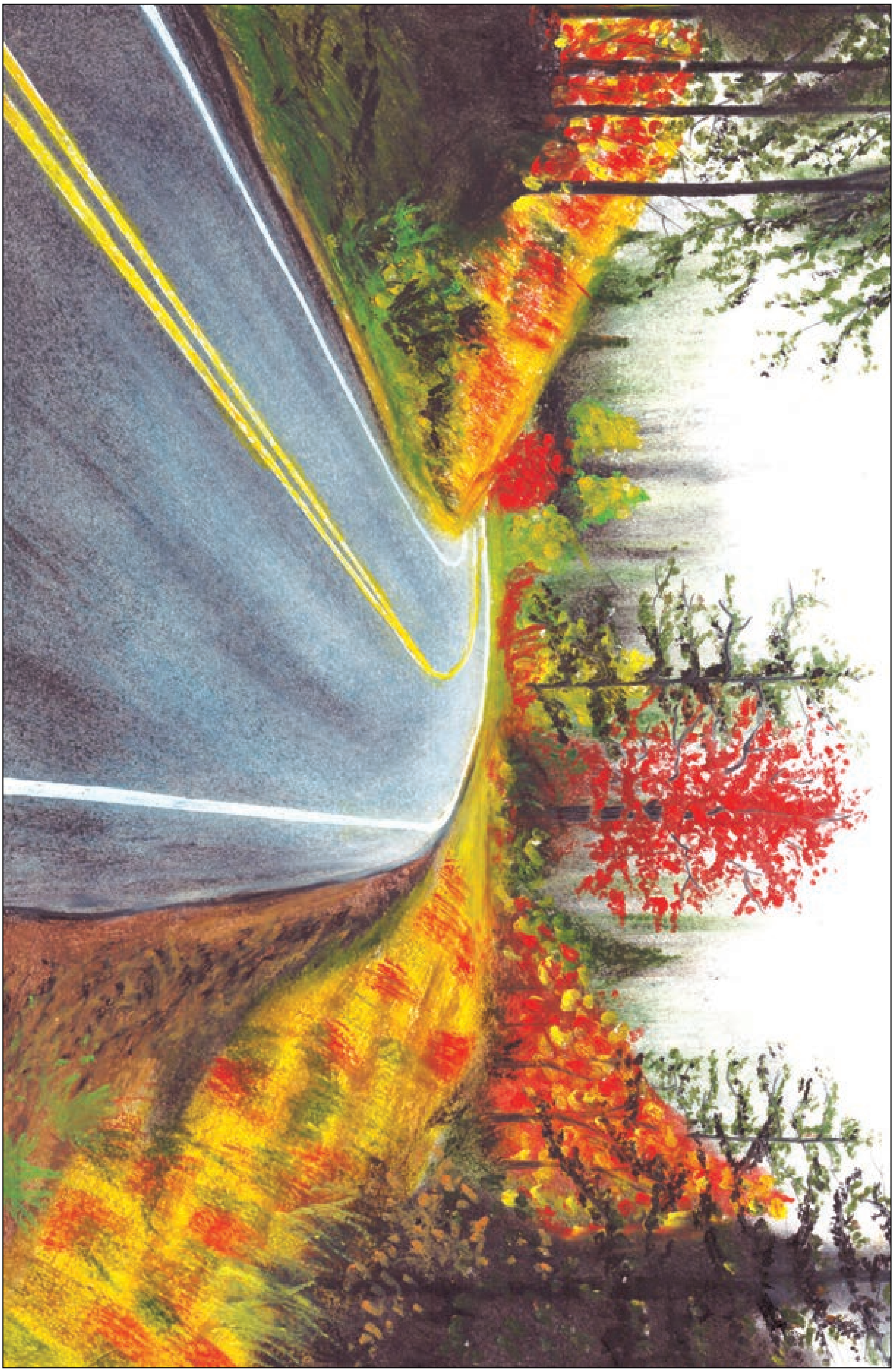

পায়েল নন্দী, ষষ্ঠ অর্ধবর্ষ, বাণিজ্য বিভাগ

শৌনক গুপ্ত বক্সী, তৃতীয় অর্ধবর্ষ, ভূগোল বিভাগ

চঞ্চল সাউ, তৃতীয় অর্ধবর্ষ, ভূগোল বিভাগ

অয়নাংশু সরকার, সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ

বিদ্যাসাগর জন্মজয়ন্তী, উইমেনস ডেভেলপমেন্ট সেল, ২০২২

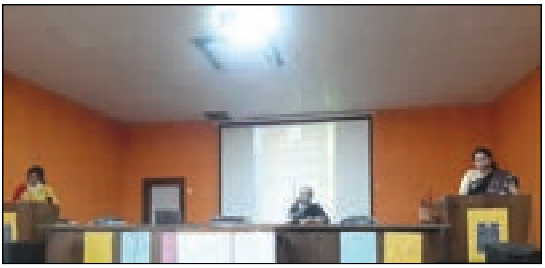

আন্তর্জাতিক নারীদিবস, উইমেনস ডেভেলপমেন্ট সেল, ২০২২

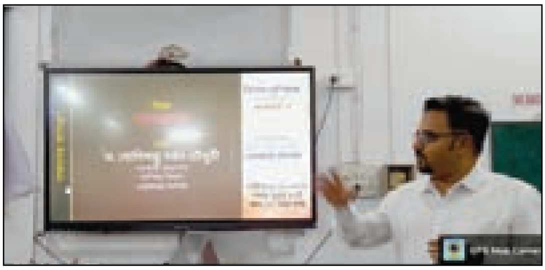

বিশেষ শ্রেণিকক্ষ: কথামালা ৭, বাংলা বিভাগ, ২০২২

ছাত্রছাত্রীদের আলোচনাচক্র, ইতিহাস বিভাগ, ২০২২

আন্তর্জাতিক সম্মেলন, এস.সি. / এস.টি. সেল, ২০২২

নৃত্যনাট্য কর্মশালা, বাংলা ও ইংরেজি বিভাগ, ২০২২

স্বাধীনতা দিবস, ২০২২

শিক্ষামূলক ভ্রমণ, ভূগোল বিভাগ, ২০২২

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ২০২২

রবীন্দ্রজয়ন্তী, কালচারাল কমিটি, ২০২২

ইস্ট জোন ইন্টার ইউনিভার্সিটি দাবা প্রতিযোগিতার বিজয়ী দল, ২০২২

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার বিজয়ী দল, ২০২২

বিশ্ব যোগ দিবস, ২০২২

বিশ্ব সঙ্গীত দিবস, ২০২২

কলেজ পিকনিক, ২০২২

আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র, অর্থনীতি বিভাগ, ২০২২

বিদ্যাসাগর বিষয়ক আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র, ২০২০

বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ভূলোগ বিভাগ, ২০২২

স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ড: সচেনতা শিবির, ২০২২

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় স্থানাধিকারী, ২০১৯

লাইব্রেরি, হেরম্বচন্দ্র কলেজ

শিক্ষাকর্মীবৃন্দ, হেরম্বচন্দ্র কলেজ

অধ্যক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দ, হেরম্বচন্দ্র কলেজ

Beyond GDP: Exploring Bhutan's Gross National Happiness Index

Bodhisattwa Bardhan Choudhury

The Gross National Happiness Index is a measure of economic and social progress that was developed by the Kingdom of Bhutan. It is a unique approach to development that emphasizes the importance of people's happiness and well-being, rather than just measuring economic growth. The GNH index has become a symbol of Bhutan's commitment to sustainable development and its efforts to create a more equitable and balanced society.

The idea of GNH was first proposed by the fourth king of Bhutan, Jigme Singye Wangchuck, in 1972. He believed that economic growth alone was not sufficient to create a happy and prosperous society. The king argued that development should be guided by the principles of spiritual, cultural and environmental values and that the ultimate goal of development should be to promote the happiness and well-being of the people.

To achieve this goal, Bhutan developed a unique system of measuring progress and development. The GNH index is based on four pillars: sustainable and equitable socio-economic development, preservation and promotion of cultural heritage, conservation of the environment and good governance. Each pillar is further divided into several domains and indicators that measure different aspects of well-being and happiness.

- The first pillar of the GNH index is sustainable and equitable socio-economic development. This includes indicators such as income, education, health, and living standards. Bhutan believes that economic development should be balanced with social development and that everyone should have access to basic needs and services. The indicators under this pillar are used to measure the level of economic and social development in the country.
- The second pillar of the GNH index is the preservation and promotion of cultural heritage. Bhutan has a rich cultural heritage that is deeply rooted in, its Buddhist traditions. The country believes that culture is an important aspect of happiness and well-being and that it should be preserved and promoted. The indicators under this pillar measure the level of cultural participation and preservation in the country.
- The third pillar of the GNH index is the conservation of the environment. Bhutan is known for its pristine natural beauty and biodiversity. The country believes that the environment is a critical component of happiness and well-being and that it should be conserved and protected. The indicators under this pillar measure the level of environmental sustainability and conservation in the country.
- The fourth pillar of the GNH index is good governance. Bhutan believes that good governance is essential for

creating a happy and prosperous society. The country has a unique system of governance that is based on the principles of democracy, decentralization and participation. The indicators under this pillar measure the level of governance and accountability in the country.

The GNH index has become a symbol of Bhutan's unique approach to development. The country has been able to balance economic development with social and environmental sustainability and has created a more equitable and balanced society. The GNH index has also inspired other countries to adopt similar measures of progress and development.

One of the most important aspects of the GNH index is its focus on people's well-being and happiness. Bhutan believes that happiness is a fundamental human right and that development should be aimed at promoting happiness and well-being. The GNH index has helped Bhutan to prioritize people's well-being over economic growth and has created a more balanced and sustainable approach to development.

The GNH index has also helped Bhutan to identify areas where it needs to improve. For example, the country has identified the need to improve its healthcare system and to provide more access to education. The GNH index has helped Bhutan to focus on these areas and to develop policies that promote social and economic development.

One of the criticisms of the GNH index is that it is difficult to measure. Happiness and well-being are subjective concepts that are difficult to quantify. However, Bhutan believes that the GNH index is a more comprehensive measure of development than traditional measures of economic growth, such as Gross Domestic Product (GDP). While GDP measures the size of a country's economy, it does not necessarily reflect the well-being of its people. For example, a country with a high GDP may have high levels of inequality and poverty, which can negatively impact the happiness and well-being of its citizens.

Another criticism of the GNH index is that it is not applicable to other countries. Bhutan's unique culture and values make it difficult to replicate the GNH index in other countries. However, other countries have shown interest in adopting similar measures of progress and development. For example, the United Arab Emirates has developed a National Happiness Index that is based on the principles of the GNH index.

Despite these criticisms, the GNH index has had a positive impact on Bhutan's development. The country has been able to achieve a high level of social and economic development while maintaining its unique cultural and environmental heritage. Bhutan has also become a leader in sustainable development and has inspired other countries to adopt similar approaches.

The GNH index has also helped to promote international dialogue on sustainable development. Bhutan has hosted several international conferences on GNH which have brought together experts and policymakers from around the world to discuss sustainable development. The GNH index has also been recognized by the United Nations which has adopted a resolution calling for the adoption of measures of progress and development that go beyond GDP.

As Bhutan continues to develop it faces several challenges in maintaining it's commitment to the principles of the GNH index. One challenge is the pressure to prioritize economic growth over social and environmental sustainability. Bhutan's economy is heavily reliant on hydropower exports and the country is currently pursuing several large-scale hydropower projects.

While hydropower is a clean and renewable source of energy, large-scale projects can have negative impacts on local communities and the environment.

Another challenge is the growing influence of Western culture and values in Bhutan. As Bhutan becomes more connected to the global economy, it is becoming increasingly exposed to Western consumerism and individualism. This can undermine traditional Bhutanese values of community and collective well-being which are central to the GNH index.

To address these challenges, Bhutan has launched several initiatives to promote sustainable development and maintain it's commitment to the GNH index. These initiatives include:

- The Bhutan for Life initiative: This initiative aims to conserve and protect Bhutan's natural resources, including forests, wildlife and freshwater ecosystems. The initiative is supported by a coalition of government agencies, civil society organizations and international donors.
- The National Green Export Strategy: This strategy aims to promote sustainable economic growth by promoting environmentally friendly exports. The strategy focuses on developing industries such as organic agriculture, eco-tourism, and renewable energy.
- The 12th Five-Year Plan: This plan, which covers the period from 2018 to 2023, emphasizes the need to balance economic growth with social and environmental sustainability. The plan includes targets for reducing poverty, increasing access to healthcare and education and promoting sustainable agriculture.
- The Gross National Happiness Commission: This commission is responsible for overseeing the implementation of the GNH index and promoting policies that prioritize people's well-being and happiness.

Despite these initiatives, Bhutan still faces several challenges in maintaining it's commitment to the GNH index. The country's economy is heavily reliant on hydropower exports and large-scale hydropower projects can have negative impacts on local communities and the environment. Bhutan also faces pressure to adopt western consumerism and individualism, which can undermine traditional Bhutanese values of community and collective well-being.

In conclusion, the Gross National Happiness Index is a unique approach to development that emphasizes the importance of people's well-being and happiness. Bhutan has been able to achieve a high level of social and economic development while maintaining its unique cultural and environmental heritage. However, the country faces several challenges in maintaining its commitment to the GNH index, including the pressure to prioritize economic growth over social and environmental sustainability and the influence of western culture and values. Bhutan will need to continue to balance these competing interests and prioritize people's well-being and happiness in its development policies and strategies.

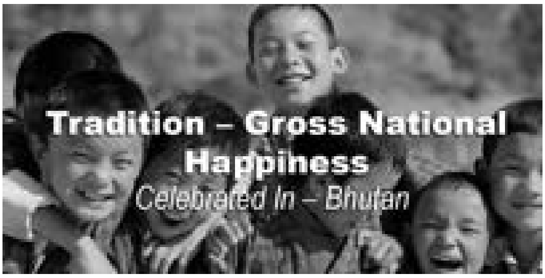

Assistant Professor, Department of Commerce

Financial Inclusion of Self-Help Group (SHG) Members with Special Emphasis on People with Disabilities

Paromita Dutta

Empowerment is a process that challenges traditional power, equation and relation. Without empowering women no country can move forward. Empowerment of women can be regarded as proper, equal and redistribution of power that challenges male dominance. On one side, India has a rich heritage that shows how women of our nation are respected. On the other side, some women are just treated like second grade citizens. Though many movements had been carried out by our political leaders, many policies had been framed to generate equality among men and women with no real solution as such.

In today's world, government as well as non-government organisations are conducting many activities for empowering women that aims at higher literacy level and education, increased participation in social and economic forums, awareness about their rights, improved standard of living, participation in decision making process and achieve self-confidence. One of the ways of supporting women empowerment is through Self-Help Groups (SHGs), which are mainly concentrated in rural areas, where a group of people (mostly women) of homogeneous social and economic backgrounds come together and save regular small sums of money, mutually agreed to contribute to common fund and to meet their needs in case of emergency on the basis of mutual help. They pool their resources to become financially stable and making everyone in that group self-employed.

Features of Self-help group:

1. The size of SHGs may vary from group to group. Basically on the basis of various purposes different groups are formed for example; mutual support groups, savings and credit groups, learning groups, empowerment groups etc. The group which is democratic, rational, accountable and homogeneous usually sustained.
2. Each member of the group plays a predominant part.
3. The objective of each group should be clear, written and known to all members.
4. All the members should contribute towards the formation and various activities of the group for SHG's better sustainability.
5. Dynamism among group members is also needed, the composition and life-span of the group depends on requirements and 'felt needs' of its members. But to make a group sustainable, its members should not be complacent with past ideas and experiences but they should definitely try to grow with time and enhance their skills.

6. More dynamic the members, lesser inter-group conflicts, increase cohesiveness in the group, decreases the chance of dissolution.

Special Emphasis on SHGs with Physically Disabled People

Disabled people not only require independence but it is also essential to have a group which provides support and empathetic relationship. These groups usually meet, discuss and represent their interest and needs to outside world. SHGs with disabled people can support each other, advocate jointly to obtain services, aids and equipment and to form a larger community.

SHGs are emerging to include new ways to assist people with disabilities to live an independent life in the society. The assistance that are being provided to them are self employment, mobility aids, inclusion in regular schools and other training institutions, assistance to various income generating activities and so on.

Conditions essential to organise SHG with disabled people:

1. To set up and agree on different activities or tasks to be performed by group members.
2. To educate the group members regarding the services available from Central or State government.
3. To orient them on savings and credit management activities.
4. To foster amongst them the spirit of self employment through training, credit, technology, infrastructure and marketing.
5. To help the members in raising resources for any income generating activities.

SGSY: Swarnajayanti Gram Swarojgar Yojana (SGSY), a self-employement programme of Ministry of Rural Development, which aims at providing assistance to below poverty line (BPL) rural people for establishing micro enterprises through bank credit and government subsidy to acquire income generating assets. It was first announced in 1997 to commemorate fifty years of India's independence and the first allocation was included in the GOI budget of 1999/2000 under the Ministry of Rural Development (MORD). Under SGSY, the individual beneficiaries and members of SHGs are called swarozgaris. Focus is given on vulnerable groups like; SC/ST should be at least 50% of swarozgaris, women 40% and disabled 3%. List of BPL households identified through BPL census and duly approved by Gram Sabha. Generally a SHG is formed with 10-20 members but, if the group is formed by taking members from remote and difficult areas like deserts, hills or places having scarce population or members are disabled then, the numbers can be from 5-20. The MORD was to fix the shares of each district roughly on the basis of numbers of poor residing. 75% of the funds would come from the Union Government and for remaining 25% each State Government should match it. Source: http://rural.nic.in/FAQ_SGSY.pdf

Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005 (MGNREGA) provides enhancement of livelihood security of the households in rural parts of the country, by providing at least 100 days of guaranteed wage employment in every financial year, to every households whose adult members are doing unskilled manual work.

As per National Centre for Promotion of Employment for Disabled People, MGNREGA is not very helpful for disabled people as identification of suitable work for disabled people has not been recognized. Very few states like Andhra Pradesh and Tamil Nadu had come up with various

To what extent this poverty alleviation program is helpful in providing employment facilities to disabled people?

Employment provided to HHS person (in days)	**2.31 (in crores)**
Total:	62.57
SCs:	14.45 crores (23.10)
STs:	9.59 crores (15.33%)
Women:	34.91 crores (55.78%
Others:	38.53 crores (61.57%)
Total works taken up:	44.18 lakhs
Work Completed:	4.22 lakhs

Source: nrega.nic.in

employment and promotion schemes in association with various national and international NGOs. Policies are good but implementation is poor, there is a provision of 100 days employment but only few of disabled have been provided the benefits. In rural areas, disabled people have limited knowledge about various schemes and policies. At the same time, government officers have no complete knowledge about the disability legislation. Another reason is that access to the field site is very difficult for persons with disability in rural areas.

Are the conditions for getting jobs in private sectors improved?

Confederation of Indian Industry (CII) has introduced 'Corporate Code on Disability' in 2006. Most of the companies did not show any interest in this agenda. The Central Government later on introduced another scheme after learning about the drawbacks of the first one, 'Incentive to Employers', which is providing 1 lakh jobs to persons with disabilities in 2006-07, but no further action has been taken for implementing the scheme.

Recently, as per the Companies Act, 2013, a new category 'Corporate Social Responsibility' has been introduced for development of marginalised people and inclusion of weaker sections of the society who are treated as 'beneficiaries' but, what would be the implications of CSR on disabled people was not mentioned clearly in this act. Hence, generation of self-employment for disabled people is the best option to include the most excluded section of the society (specially the women disabled).

Assistant Professor, Department of Commerce

Treading Lightly in the Abode of the Thunder Dragon

Trambak Bhattacharya

“....... Change it to.......land of the peaceful dragon.......”, exclaimed a boy from the other side of the cafe as he continued to narrate his recent trip to Bhutan to his reluctant friends who would’ve rather gossip about something else while I was sipping from a cup of coffee and couldn’t help overhearing some of their conversations.

The words ‘peaceful dragon’ got embedded in my mind as soon as they reached my ears. I couldn’t resist thinking about it until a month later, I found myself on a train bound for Coach Behar, cruising through the heart of the state. The romantic feeling of “mountains are calling me” started to circle my mind until a voice claimed its presence going with ‘Chaiiiiiiiii......’ - a regular yet soothing occurrence aboard the Indian Railways.

It was noon time next day when I stepped foot on Coach Behar where my ride to Jaigaon would be waiting for me and so it did. Owing to the lack of railway communication to Jaigaon (Bhutan immigration post), Coach Behar and Hasimara are the two stations that could be availed and I went with the former - the road less travelled.

A two-hour swooping car ride bypassing the Chilapata Forest, leaving itself as a prospect for a visit ensured my safe arrival to India’s border with Bhutan, Jaigaon.

My arrival to Jaigaon was in the afternoon, vacating some time to square out Jaigaon (India) and Phuentsoling, our first point of contact with Bhutan in the evening. And so deciding on that, I find myself streaming the buzzing market area of Jaigaon while a step towards Bhutan’s front made all the noise a mere echo.

Phuentsoling is a quiet town acting as a lifeline for Bhutan as every necessary item gets imported from India to the kingdom from here only.

With a few grocery shops selling juices with an exquisite taste, an in-neighbourhood monastery, residential buildings and hotels, the town sets up a perfect introduction for Bhutan and gives us a hint about what’s to come!

I am still browsing the juice containers at a store and suddenly a bell tolled, but for whom? Don’t be afraid! it was from the border gate signalling they are about to close the gates in 10 minutes like every day it closes at 9 pm. I’m fast with my legs, so a brisk walk from the store to the gates ensured a roof over my head for the night as I will be staying at Jaigaon.

The next day, the immigration office finally approved my pass after two hours of wait and I was on my merry way in search of Paro soon after. Along the way, I must

acquaint the reader with Bhutan's most beautiful and picturesque valleys which were a companion throughout the trip and never ceased to amaze. In front of the gorgeous valleys with crystal clear water flowing through them, none of the 'sight-seeing' places could compete.

Soon Paro became visible on the horizon, a small town with Bhutan's only airport at the heart of it and a distant view assured something spectacular but only when visited. Curious thing is that I am mapping all of these from atop a cliff which came along the highway and from where any visitor could see the whole town of Paro under a miniature lens.

Bhutan's implementation of environmental laws has worked to its full potential and Paro, like many other places in the kingdom sets an example of that. You would roughly find a piece of plastic or any kind of rubbish in the streets while that kind of scene makes you realise they have put 'Cleanliness before Godliness' in their motto - and Bhutanese take it seriously.

The Paro River holds a soothing scenario as the cool and clear water of the river reflects the visitor's image like a mirror up close and the hills around it when seen from a distance.

The next thing that my attracted me was one of the best things anyone could see in their life. Upon reaching the bird's eye viewpoint of Paro, I was in luck, an aeroplane taking off and finding its pace by carefully swifting through the mouths of two hills side-by-side, and this is the reason why Paro is one of the world's difficult take-off zones. What seemed an incredible picture now was not so much back in the early days of the airport's operation. The first day at Paro ended on a good note and the second

Paro Taktsang/Tiger's Nest as seen from the viewpoint

holds much excitement.

It's the early morning of my second day in Bhutan and the most important day of the trip, today we conquer Tiger's Nest!

Let me first provide a run down of the Tiger's Nest to the reader and help them to gear up for a long trek. Tiger's Nest is a monastery located along a cliffside of a hill and 'a thing of beauty' when seen from the viewpoint atop an adjacent hill.

So here we stand, before a steep trek of 3-5 hours.

The initial stages were pleasant, the trail went through a forest on both sides, with no sign of a cliff, rather a straight path and even if there were any twists and turns, it was not manageable to understand. The steepness of the hill can be felt now after an hour of trek, one could easily sense a pull and a little more effort to make a step forward.

Not a boring ride, I would say, sometimes the overgrowth of trees faded a little allowing to see through them, the town of Paro could be seen while a gush of cool breeze rejuvenated the tired trekker's soul.

2 hours down, now the monastery looked near, the trail was connected through two hills setting up a rocky path for the trekker to reach their destination. The climb is truly strenuous and no wonder, many are leaving upon reaching the viewpoint owing to the rocky path ahead.

This path of the trail although filled with rocks is more open and any kind of outgrowth is rare while the sun came beating down.

At last! the tiredness seemed to vanish, hard work bore fruit as I was walking the steps of the monastery after a 3-hour strenuous trek.

The view from the spiritual settlement is a scene which I cannot describe in words. The trail looked miniature with people still climbing, on the side was a waterfall culminating in a small lake bounded by three hills covered by forests and the scene can easily be named a 'nature's lap'.

The climb down seemed a little lighter but it also became a little quieter. It is about 4 p.m. and I am halfway through the trail, people were scarce as it was the time of return. The forest is inhabited by wolves, hyenas and dogs. The dogs seemed friendly during the morning but they didn't look so in the afternoon with the time of their prominence approaching fast.

Still, I made it out alive and it was an experience of a lifetime. We don't get to trek mountains nor do some of us possess the strength for that but Tiger's Nest fulfilled that wish in a strenuous yet worthful way.

The capital city of Thimphu was the next on my list and the city looked far more filled with hustle and bustle than the sleepy town of Paro. A good place for shopping but not so much for the people like me seeking nature's eminence.

The Buddha Dordenma, a gigantic statue of Buddha made of gold atop a hilltop is the most prominent thing to see in Thimphu.

Thimphu is the best place to try out Bhutanese cuisine, the Emadatshi is one to try out. Made with green chillies with a little spice served on a bed of rice is one of Bhutan's staples.

The next day meant the end of this wonderful trip with me returning to Jaigaon and then boarding my return train from Hasimara.

An experience of a lifetime pleased my mind and will be forever embedded so. I must not hold the reader much longer and suggest to him/her to make the possibility of visiting Bhutan a reality. However, some parts remained undiscovered but that would act as an enchantment for a return in the future.

View from the road to Paro from Phuentsholing

4th Semester, Department of English

প্রবাসী সাহিত্যিক জ্যোতির্ময়ী দেবীর ছোটোগল্পে অন্য রাজস্থান

মধুবন্তী সোম

সময়টা গত শতকের পাঁচ বা ছয়ের দশক। তৈরি রূপকথা নয়। তবে রাজারানিরা সময়ের দ্রুত পালাবদলে ইতিহাসের অন্তর্গত হয়ে গেছেন। যাঁরা ছিলেন, তাঁদের শক্তি ক্ষয়িত, দীপ্তি নিষ্প্রভ, বুড়ো সিংহের মতো ক্ষমতা-প্রতাপের চাবিকাঠির ব্যবহারে অক্ষম। জ্যোতির্ময়ীর জীবৎকালেই ক্রান্তিযুগের দৃশ্যমান পটে গণতন্ত্রের হাতে পরাভূত হয়েছে রাজতন্ত্র। আবার রাজ-আধিপত্যের পূর্ব চেহারাটাও বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়নি। এমন এক যুগসন্ধিক্ষণে অহংসর্বস্ব একনায়কতন্ত্রের বিকৃত জীবনের যবনিকা তুলে ধরলেন জ্যোতির্ময়ী। পাথরের প্রাসাদ আর অতন্দ্র প্রহরা এড়িয়ে সে-জীবন আমদুনিয়ায় পৌঁছাতে পারে না। ইতিহাস তার খবর রাখে না, সভ্যতা সে কথা ভুলে স্বস্তি পায়। হদিশহীন গোপনীয়তায় ডুবতে ডুবতে সেই অজ্ঞাত গল্পেরা, খড়কুটোর মতো আধুনিক রূপকথাকে জড়িয়ে ধরে বেঁচে উঠতে চায়। বেঁচেও ওঠে জ্যোতির্ময়ীর কল্পনা আর কলমের শুশ্রূষায়।

জ্যোতির্ময়ী দেবী (১৮৯৪-১৯৭৪) আমাদের রাজারানির যে গল্প শুনিয়েছেন সে রাজকাহিনি রূপকথা নয়, বরং রাজপ্রসাদের অন্তর-অন্দরের চুপকথা—ইতিহাসে অলিখিত কাহিনি। রাজপরিবারের প্রস্তরের দেওয়ালে প্রতিবিম্বিত প্রাত্যহিক হাসি-কান্না, রহস্য-রোমাঞ্চের ছায়া, কায়া হয়ে উঠেছে জ্যোতির্ময়ীর কলমে। 'রাওলা'-কে ঘিরে পুরুষানুক্রমে যে ঐশ্বর্য সমাকীর্ণ ভোগসর্বস্ব অলস-আবিল যাপনভার, তারই বিস্মিত অনুপুঙ্খ চিত্রে ভরে আছে তাঁর গল্প-সম্ভার। জীবনের এই বাস্তব উপাদানের আয়োজনে তিনি যে রূপকথা লিখতে বসেন সেখানে শুধু রাজা-রানি-মন্ত্রী-সান্ত্রি চরিত্রের মধ্যেই কাহিনি আবদ্ধ থাকে না, শুয়োরানির প্রতিহিংসায় দুয়োর নির্বাসন এবং অবশেষে রাজার সঙ্গে পুনর্মিলনের সহজ সমাধানে এ গল্পের নটে গাছ মুড়োয় না। গল্প শুনে ফেলে, অনেক গভীরের গুঞ্জন। বিলাসের বহুল সম্ভার আর ব্যাভিচারের বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে মহলের পর মহল সুসজ্জিত। সেখানে পাপ, প্রতিহিংসার পাকদণ্ডি বেয়ে অনেক শৈশব, কৈশোর নীরবে হারিয়ে যায়। ডারউইনের তত্ত্বের নির্ভেজাল রূপায়ণে অস্তিত্বের জন্য সংগ্রামে হয় যোগ্যতমের উদ্বর্তন। নিষ্ঠুর স্বার্থপরতা, যন্ত্রণার পথে পিষ্ট হয় স্বাভাবিকতা, মনুষ্যত্ব। জৌলুসের উজ্জ্বল প্রদীপের নীচে চোখে পড়ে নগ্ন, বিকলাঙ্গ জীবনের কালিমা। রাজস্থানের পটভূমিতে লেখা জ্যোতির্ময়ীর গল্পগুলি চমকে দিয়েছিল সমকালীন পাঠক সমাজকে। মরুপ্রদেশে জন্মানো বাঙালি মেয়ের কলম-প্রসূত গল্পে কঠোর রাজ-অবরোধের অন্তর্ভেদ করা দুঃসাধ্য ছিল—সে সময়ে এইসব কথা লিখার সম্ভাবনা বা সাহস ছিল না। কেননা বাড়ির প্রায় সকলেই ছোটবড় রাজকর্মচারী। তাঁরা এই অন্তঃপুর এলাকার প্রসঙ্গে বিপন্ন হতে পারতেন।"[১] হারেমের গহন গোপনীয়তার আব্রু অপসারিত হলে রাজকীয় আনুগত্যের মুখ ফিরিয়ে নেওয়ারই কথা। কে আর চান দমিত নারী-মনে সঞ্চিত বারুদের জ্বলে ওঠার সম্ভাবনাকে সুযোগ দিতে? পারিবারিক কারণে রাজপরিবারের প্রতি তাঁর মোহভঙ্গের অভিজ্ঞতাকে নীরব রেখে জ্যোতির্ময়ী সেদিন বিবেচনার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাই তাঁর অভিজ্ঞতা অর্জন এবং গল্প রূপায়ণের মাঝখানে কেটে গিয়েছিল অনেকগুলো বছর। তাছাড়া ছেলেবেলায় দেখা এই অভিজ্ঞতা দীর্ঘদিনের জারণে পেয়েছিল পরিণত হওয়ার সুযোগ। প্রাপ্তবয়স্ক মনের উত্তাপে পুরোনো অভিজ্ঞতা পেয়েছিল সংযমী, বুদ্ধিদীপ্ত, নিরাসক্ত হওয়ার শিক্ষা। ধীরে ধীরে উপযুক্ত সময়ে তাঁর হাত থেকে ব্যতিক্রমী নৈপুণ্যে বেরিয়ে আসে অন্ধকার সুড়ঙ্গ পেরোনো হারেমের চুপকথা, আরাবল্লীর আড়ালে থাকা রাজবাড়ির রূপকথারা।

নিজের অভিজ্ঞতায় দেখা রাজ-অন্তঃপুরের এক

বিশাল নারীশালার বর্ণনা দিয়েছেন জ্যোতির্ময়ী দেবী। মোগল সম্রাটদের মতো রাজস্থানের রাজ-অন্তঃপুরের নারীশালার প্রধানা ছিলেন মহারানি। প্রায় দু-তিন শতাধিক সখিসহ তাঁর ছিল নিজস্ব বিশাল প্রাসাদ। এই সখিদের কাজ ছিল রাজারানির সেবা করা এবং অন্তঃপুরে নাচ, গান এবং অভিনয় করে রানিদের মনোরঞ্জন করা। বিলাসী আদব-কায়দায় শিক্ষিত সখিরা দক্ষ রাজমনোরঞ্জনকারিণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হতে 'পাত্রী', 'পাত্রী' থেকে 'পর্দায়েত', 'পর্দায়েত' থেকে 'পাশোয়ান' খেতাবের মধ্যে নারী জীবনের একমাত্র সার্থকতা অন্বেষণ করত। শুধু গালভরা নাম নয়, যারা রাজার প্রিয়তমা হয়ে উঠত, তারা খেতাবের সঙ্গে সঙ্গে লাভ করত প্রবল ক্ষমতার অধিকারও। অনেকে পদমর্যাদায় না পারলেও ক্ষমতায় মহারানিকে ছাড়িয়ে যেত।

রাজ-ঔরসে জন্মালেও সখি-গর্ভের সন্তানেরা হত অবৈধ। রাজার পুত্ররা 'লালজীসাহেব' এবং কন্যারা 'বাঈজীলাল'-এর তকমায় স্নেহ পেলেও, সম্পত্তি পেলেও, সমাজে যথার্থ সম্মান পেত না। মহারানি ছাড়া রাজার অন্যান্য রানিদেরও ছিল বিশাল সখিসম্ভার, যাদের অনেককে গ্রাম গ্রামান্তর থেকে জোর করে বা কিনে আনা হত (যেমন: ধাপি)। কেউ বা বাড়ির মেয়েকে স্বেচ্ছায় দিয়ে যেত রাজপ্রাসাদে (যেমন: উমদাবাঈ)। আবার রানিরা পিতৃকুল থেকেও যৌতুক হিসাবে পেত বাছাই করা সখিদের (যেমন: কেশর)।

অন্তঃপুরের একেবারে নীচের স্তরে ছিল বাঁদী ও দাসী। বাঁদীরা ছিল অন্তঃপুরবাসিনী। কিন্তু দাসীরা ভিতর ও বাহিরে খোজার অনুমতির বিনিময়ে আসা-যাওয়া করতে পারত।

কেমনভাবে যাপিত হত অজস্র সুরূপা সুবেশিনী নারীর জীবন! জ্যোতির্ময়ী জানাচ্ছেন, এই বাঁদী ও দাসীরা একসঙ্গে একটি বড়ো ঘরে চল্লিশ-পঞ্চাশ জন করে বসবাস করত। আর সখিরা একটি বড়ো ঘরে একসঙ্গে কুড়ি-পঁচিশ জন করে থাকত। অলস দিবস অতিবাহিত হত ঘুঁটি, পাশা আর দাবার ছকে। তবে মহারানি, রানি, পর্দায়েত ও পাশোয়ানদের নিজস্ব প্রাসাদ ও ভবনের ব্যয়ভার বহনের জন্য নিজস্ব হিসাবনিকাশের বিভাগ ছিল। তাদের অর্থের উৎস, পিত্রালয়ে পাওয়া জায়গীর বা রাজার কাছে উপহারে পাওয়া সম্পত্তি ইত্যাদি।

রানিদের ছিল আলাদা মহল, আলাদা জায়গির, বিপুল ঐশ্বর্য, অপরিমিত দাসদাসী, কামদার, সখি ও নর্তকীর দল। তাছাড়া বিভিন্ন বিভাগীয় কর্মীর তত্ত্বাবধানে অন্তঃপুরে প্রাসাদের কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হত। আয় বিভাগ দেখতেন মুনশি-জী বা নাজির-জী। তাছাড়া ছিল দর্জি, রংরেজ, কুম্ভকার, ছুতোর, হালি, মালি, ভিস্তি। সব মিলিয়ে রাজ-অন্তঃপুরের মধ্যেই চলত যেন এক একটি পৃথক রাজ্য। সব ছিল, কিন্তু ছিল না 'স্বামী-পুত্র-কন্যা-স্বজন-আত্মীয় নিয়ে একটি জীবনযাত্রা, জীবনধারা। ছিল না শিশুজন্মের আনন্দ, স্বজন-বিয়োগের দুঃখ, দাম্পত্য প্রেমের বেদনা-বিরহ, সুখ-মিলন। সাধারণ মানুষের, সাধারণ জীবনের সুখও ছিল না দুঃখও ছিল না। একেবারে ফাঁকা জগৎ একটি।'[৩]

মৌচাকে যেমন একটিমাত্র রানি মৌমাছিকে কেন্দ্র করেই জীবনচক্র চলে, তেমনি রাজ-অন্তঃপুরীয় মধুচক্রের একমাত্র পুরুষ স্বয়ং রাজা। শত শত নারীর জীবন-যৌবন আবর্তিত হয় সেই পৌরুষহীন একক পুরুষপুরীতে। যত কুঁড়ি জন্মায় তার একভাগও ফোটার সুযোগ পায় না। কে রাজার কত কাছে পৌঁছতে পারবে, তারই উপর নির্ভর করে নারীর পদোন্নতি। 'সখী' থেকে 'পাত্রী', 'পাত্রী' থেকে 'পর্দায়েত'। রাজার প্রিয় প্রেয়সীর সর্বোচ্চ খেতাব 'পাশোয়ান', যার ক্ষমতা অনেকক্ষেত্রে মহারানিকেও হার মানায়। 'পাশোয়ান' বা 'পর্দায়েত' হওয়ার পর মহারাজের সন্তান গর্ভে ধারণ করলে মিলবে জায়গির, আলাদা মহল, কিছুটা সম্মানও। রাজ-সান্নিধ্যের জন্য প্রাসাদের অন্তরে আর অন্দরে চলে অমানবিক ঈর্ষান্বিত প্রতিযোগিতা। এভাবেই পুরুষের তৈরি করা পুরুষতন্ত্রের সুযোগ্য বাহক হয়ে ওঠে মেয়েরাই। 'রাজারাণীর যুগ' প্রবন্ধ গ্রন্থে নির্মোহ ভঙ্গিতে জ্যোতির্ময়ী তাই জানিয়েছেন, '...কোনোখানে পুরুষ এই অনাচার করেছে, কিন্তু নারীও নিষ্ঠুরতার ইতিহাসে কম যায়নি।[৪] আর সেকারণেই রাজার প্রেয়সী প্রেমরায়ের রোষ ও ঈর্ষার পাত্রী হয়ে ধাপি দুর্গতলের অন্ধকার কারাগারে মৃত্যুবরণে বাধ্য হয়। রাজ-ভোগে অসম্মত কেশরকে মরতে হয় তেলের প্রদীপ উল্টে যাওয়া বিছানার আগুনে। রাজপ্রাসাদের জঞ্জাল সাফাই করবার পেছন দরজা দিয়ে দেয়াল ভেঙে বার করা হয় চিত্রকূটবাঈ, অলহ্যাবাঈ, পম্পাবাঈ-এই তিন রূপবতীর আগুনে পোড়া শবদেহ। নূরজাহানের মতো ক্ষমতাধারী সুমেরু রায়কে বিষের পাত্র হাতে তুলে নিতে হয়। নগরের উচ্চাকাঙ্ক্ষী কোনও শেঠানীকে (শেঠ-এর স্ত্রী) প্রত্যহ একটু একটু করে বিষপান করিয়ে মৃত্যুর ঘরে

নির্বাসিত করা হয়। নিস্তার পান না রাজমাতা কিংবা স্বয়ং রানিও।

রাজস্থানি প্রসাদের অন্দরমহলের এই সব গহন, গোপন কথা বলতে গেলে প্রথমেই মন খারাপ হয়ে যায় ধাপির জন্য । দুই দিদির পর সকলের আশায় ছাই ঢেলে মায়ের তৃতীয় কন্যাসন্তান সে। কাজেই হতাশার কেন্দ্র থেকেই নির্ধারিত হল তার নাম ধাপি অর্থাৎ আর নয়, ঢের হয়েছে। জ্যোতির্ময়ীর আন্নাকালী গল্পে বাঙালি ঘরের পঞ্চম কন্যার নাম যে কারণে আন্নাকালী (আর-না-কালী) ঠিক সেই কারণে রাজস্থানি পরিবারের তিন নম্বর কন্যার নাম ধাপি। তবে পৈতৃক সংকর রক্তপ্রবাহের জীবন-বৈজ্ঞানিক কারণে সে পেয়েছিল অতুলনীয় রূপের মহিমা। 'আপনা মাঁসে হরিণা বৈরী'র মতো তার রূপই তাকে বিলাসী তিমিরে তলিয়ে নিয়ে যায়। রাজবাড়ির মেয়েধরাদের নজরে পড়ে সে। দারিদ্র্যের সঙ্গে যুঝতে থাকা ধাপিরা গহনা ভরা সুসজ্জিত বর্ষীয়সী মহিলাদের রূপকথার স্বপ্নে ভোলে। তাই গরিব বাবার মেয়েকে বিক্রি করার নেপথ্যে সবারই যেন অবচেতনে এক প্রচ্ছন্ন সম্মতি থেকে যায়, এমনকি ধাপিরও। মেয়ে পণ্য হয়, স্নেহ হার মানে, দরিদ্র-জীবন দুঃখ ভুলে একটু স্বস্তি পায়, মনুষ্যত্ব আরও দরিদ্র হয়। কিন্তু প্রতিবাদ দানা বাঁধে না। সব পেয়েছির দেশে যেতে গিয়ে সব খোয়ায় তারা।

রাজপ্রসাদে, জীবনের নতুন এক অধ্যায় শুরু করে ধাপি। সমস্ত অতীত ধুয়ে তার নামকরণ করা হয় গোদাবরী বাঈ—'পাত্রী' গোদাবরী বাঈ। কোনো এক জলসায় সুন্দরী ধাপির রূপের ঝলক এক মুহূর্তের জন্য রাজার নজরে আসে। মহারাজের প্রেয়সী প্রেমরায় লক্ষ করে, সে মুগ্ধতা। রাজপুরুষের কামনাবহ্নি গোদাবরীর রূপ স্পর্শ করার আগেই তাকে সরিয়ে দেওয়া হয় 'বাঁদীকুই'-এর ঘরে। স্বাভাবিক জীবনযাপন থেকে বঞ্চিত প্রেমরায়ের মতো খেতাবধারিণীরা একেশ্বর রাজার দাক্ষিণ্যটুকু হারাতে নারাজ। তাদেরই আক্রোশের ভয়াবহ শিকার ধাপি। অপরাধ কী বোঝার আগেই নির্বাসিত হয় সে।

বন্দিশালার নীরন্ধ্র তমসার ভয়ার্ত প্রহরে উপোসি ধাপির সামনে শুধুই ধূসর শূন্যতা। দুঃস্বপ্নও আসে না—এমনই দুরবস্থা। আঁধার কক্ষে মৃত নারীদের প্রেতাত্মার সঙ্গে চলে তার ভীত নির্বাক সংলাপ। প্রাসাদের মোহ কেটেছে, এখন সে আগের জীবন ফিরে পেতে ব্যাকুল। নিরপরাধ ধাপির জন্য স্নেহসিক্ত খোজা সর্দার-জী অনেক চেষ্টায় তাকে স্বগৃহে নিয়ে যাওয়ার ছাড়পত্র আদায় করেন। কিন্তু রাত শেষের মলিন আলোয় যখন তিনি কারাগৃহে এসে দাঁড়ান, তখন প্রদীপের আলোটুকুর মতোই নিভে গেছে ধাপির জীবনদীপ ।

তারা রূপবতী গল্পের অহল্যাবাঈ, চিত্রকুটবাঈ, পম্পাবাঈও ছিল অপূর্ব সুন্দরী। প্রতিহিংসার কবলে পড়ে আগুনে দগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিল তারা। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে গল্পকারের নিজের অভিজ্ঞতা। তিনি বলেছেন, 'একবার অন্তঃপুরে বসে আমরাও শুনলাম পরম রূপবতী তিনটি নবযৌবনা সখীর কথা। যারা গত রাত্রে ঘরে আগুন লেগে মারা গেছে। যাদের প্রাসাদের পিছনের জঞ্জাল-ফেলা পথের দেওয়ালের পাশে খানিকটা ভেঙে সৎকার করতে পাঠানো হয়েছে।'[৫] কেন তাদের মৃত্যু হল, কে তাদের মারল তার কারণ জানার অধিকার পর্যন্ত ছিল না কারও। নারীশালায়, 'পাত্রীদের সখীদের সংখ্যা গোনাগাঁথা করে না কেউ প্রতিদিন। এই গোপন মৃত্যুর আগমনে তো কোন বাধাই কোথাও নেই। অস্বাভাবিক মৃত্যু? তারই বা কে প্রশ্ন করবে? স্বজনবন্ধুহীন অসহায় নারীদের ভাবনা ভাববার জন্য তো কেউ ছিল না। 'সাহিত্যিকেরাও সেকথা বলেননি কখনো। জ্যোতির্ময়ী ব্যতিক্রমী পথে হাঁটেন। তাঁর গল্পের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় পুরবাসী প্রান্তিকদের অবগুণ্ঠিত বেদনার উন্মোচন।

রাজ অন্তঃপুরের বিষাক্ত বায়ু মানুষের জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে দিত শুষ্ক করে। এভাবে জীবন সবুজ থেকে ধূসর হয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গে 'সুমেরুরায়'-এর কথা মনে পড়ে। সুমেরুরায়-এর গ্রাম্য নাম উমদাবাঈ। পরমা সুন্দরী উমদাকে তিন দাদা মিলে বিয়ে দেয়। শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সে বারে বারে বাপের বাড়ি পালিয়ে আসে। জাঠ কৃষক পরিবারের এই সুন্দরী, তেজস্বিনী বধূটিকে শ্বশুরবাড়ি, বাপের বাড়ি কেউই ঠিকমতো কব্জা করতে পারে না। 'সহবত' শেখানোর চেষ্টায় ভাশুরের সিদ্ধান্তে রাজার ঘরের দাসি হয়ে তার বদলি-বসত ঘটে রাজ-অন্তঃপুরে। অচিরেই রূপ ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে রাজার প্রেয়সীদের অন্যতমা উমদা পদোন্নতির ভোজবাজিতে হয়ে ওঠে সুমেরু রায়।

রূপবতী, গুণবতী ও ব্যক্তিত্বময়ী সর্বোপরি, রাজ-সোহাগিনি সুমেরু রায়। কিন্তু সে জানত রূপযৌবন ক্ষণকালের। চিরকালের ব্যবস্থা করতে হলে বের করতে হবে অন্য উপায়। তাই রাজার উপর নিজের অধিকার পাকা রাখতে গিয়ে সাক্ষাৎ গঙ্গাদেবীর অবতার

সেজে বসে সুমেরু। তার হুকুমে চলতে থাকে রাজপাট। সৌন্দর্যের মোহে আর গোপন পাপবোধে মদিরামুগ্ধ রাজাও যুক্তির স্বচ্ছতা হারিয়ে মেনে নেন সব আদেশ। সংকটে, সংহারে রাজা সুমেরুর অভিমত নেন। 'লোকে সভয়ে অনুভব করে, বলাবলি করে--জাহাঙ্গীরের নূরজাহানের মতো সুমেরুরায়ই রাজা এখন।'[৭] কানে আসে তার মা, স্বামী এবং সতীনপুত্র তার খোঁজে এসে প্রাসাদের দরজা থেকে ফিরে গেছে। গণ্ডগ্রামের আত্মীয়েরা কেমন করে তার নাগাল পাবে?

এরপর বহু বছর অতিবাহিত হয়। কিন্তু রাজার মৃত্যুর পরই সুমেরুর বুজরুকি মান্যতা হারায়। আসলে তাঁর অভিনয়ের ভান সম্পর্কে সকলেই অবহিত ছিল। রাজার মৃত্যু, সেই জমে থাকা ক্ষোভ প্রকাশের ছাড়পত্র পায় মাত্র। যারা এতদিন তার মর্জির শিকার হয়েছিল, তারা সমবেতভাবে মিশে যায় অবিশ্বাসীদের দলে। রাজার মৃত্যু হলে সুমেরুরায় পদমর্যাদাসহ সমস্ত মহিমা হারিয়ে পরিণত হয় সামান্যা নারীতে। তার স্থানান্তর ঘটে রাজ-অন্তঃপুরের অন্যান্য দাসীদের সঙ্গে। কিন্তু রক্তের স্বাদ পাওয়া বাঘের মত ক্ষমতার স্বাদ পাওয়া মানুষ দ্বিগুণ সাহসী হয়ে ওঠে, ক্ষমতাচ্যুতি তার কাছে দ্বিগুণ অসহনীয় বলে মনে হয়।

জ্যোতির্ময়ী দেবীর কলমে রাজ-অন্তঃপুরের এই সকল অজানা নারীদের মর্মান্তিক ট্রাজেডি পাঠকমাত্রের হৃদয়কে দ্রবীভূত করে তোলে। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, ঐশ্বর্য-দারিদ্র্য ইত্যাদিকে জীবনের বিপরীতমুখী ওঠাপড়ায় এক জীবনেই এদের বহু-দর্শন ঘটে। সমাজের শাসনতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় পণ্যবস্তুর মতো এই অনামী অঙ্গনারা নিজেদের ব্যক্তিসত্তাকে ভুলে যায়। নিগ্রহ, বঞ্চনার সামন্ততন্ত্রে, প্রতিবাদের সুযোগ ও সাহস দুইই হারায় তারা। জ্যোতির্ময়ী এদের ব্যথিত জীবনের প্রতি সহানুভবে প্রত্যক্ষ করেন যে, অনেক গ্রাম্যতা, নিষ্ঠুরতা, অহেতুক ইতরতা আছে সেকথা কেউ কাউকে বলে না। বলতে পারে না। ভাষাহীন ধৈর্যের সহিষ্ণুতাময় উৎপীড়নময় তাদের জীবন। ইতিহাস সৃষ্টিকারী রাজপুতদের জীবনমহিমার নেপথ্যে জমে থাকা এত বঞ্চনা প্রত্যক্ষ করে অতীত গৌরবের প্রতি তাঁর মোহভঙ্গ হয়। প্রবীণত্বে পৌঁছে সঞ্চিত স্মৃতি খুঁড়ে তাই জ্যোতির্ময়ী দেবী বেদনা জাগিয়েছেন!

জ্যোতির্ময়ী সাম্প্রদায়িক নারীবাদ থেকে মুক্ত আধুনিক। নরনারী নির্বিশেষে দলিত মানুষেরা তাঁর সাহিত্যে ভাষা পেয়েছে। কেবলমাত্র নারী নয়, পুরুষের পৌরুষও এই রাজঅন্তঃপুরে বিড়ম্বিত-অভিশপ্ত। একমাত্র যে পুরুষের প্রবেশাধিকার আছে নারীমহলে তিনি বাহ্যিক আকৃতিতে পুরুষ হলেও পূর্ণাঙ্গ নন-নপুংসক, খোজা। ক্ষমতাহীনের নিগ্রহ দেখাতে গিয়ে ইতিহাসে, সাহিত্যে এ যাবৎ উপেক্ষিত এই ক্লীব-মানুষের অস্তিত্বের সংকটকে জ্যোতির্ময়ী দিলেন এক নতুন মাত্রা।

জাঁকজমকের আড়ালে রাজকীয় সামন্ততন্ত্রের পেষণযন্ত্রে শুধু নারী নয়, পুরুষও যে একইভাবে শোষিত, সেকথা দলিত-দরদী লেখকের নিরপেক্ষ সত্য-সন্ধানী দৃষ্টি এড়ায়নি। সর্দার খোজা খুশনজরজী কিংবা বাঁদীপুত্র লালজীসাহেবের অসহায়তা তাঁকে বিক্ষত করে। জ্যোতির্ময়ী দেবীর রাজস্থানকেন্দ্রিক গল্পগুলির মধ্যে রাজপরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত পুরুষদের ট্রাজেডির দিকগুলিও প্রত্যক্ষগোচর হয়েছে। সামন্ততন্ত্রের বিষ শুধুমাত্র নারীকেই নয়, পুরুষকেও কীভাবে পীড়িত করেছিল, তার দৃষ্টান্ত ধরা আছে লালজীসাহেব ও 'খুশনজরজী' নামক গল্পদুটির মধ্যে।

'খুশনজরজী' শব্দের অর্থ হল-যাকে দেখলে চক্ষু প্রীত হয়। রাজপ্রদত্ত খেতাব, মোটা মাসোহারা, অগাধ সম্পত্তি এবং পুরুষানুক্রমিক মালিকানা থাকা সত্ত্বেও হিন্দু রাজার অন্তঃপুরের মুসলমান খোজা আল্লাবক্সের জীবন যেন কালিহীন কলমে লিখে যাওয়া খাতা। রাজ-অন্তঃপুরে বিলাসব্যসনের বিষাক্ত বায়ুতে অভিশপ্ত তাঁর জীবন। অন্তঃপুরিকাদের মতোই সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক সুখ-দুঃখ, আনন্দ থেকে তিনি বঞ্চিত। কিন্তু সম্পত্তির জ্বালা বিষম জ্বালা। উত্তরাধিকার না থাকলে যে বিফলে যাবে যাবতীয় উপার্জন। কি আশ্চর্য বিধাতার নিয়ম! ওয়ারিশ হওয়ার উপায় নেই, অথচ মনে আশঙ্কা আছে ওয়ারিশহীন সম্পদ যেন রাজ-সরকার বাজেয়াপ্ত না করে!

রাজ-উৎসবের পালা শেষে খুশনজরজী একদিন ছেলে খোদাবক্সের কাছে তাঁর অতীত বৃত্তান্ত এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বলতে বসেন। সাংসারিক সুখ শান্তি আর স্নেহমমতার লোভে তিনি বহুকাল পূর্বে ঘরে এনেছিলেন সপুত্রক নূরনেহারকে। ইচ্ছা ছিল নূরনেহারের পুত্রকে দত্তক নেওয়ার। নূরের মৃত্যুর পর তাঁর ইচ্ছাপূরণে আর কোনো বাধা থাকে না। পুত্রের কাছে তিনি অকপটে স্বীকার করেন—যেমন অপত্যহীন লোকের ধনের 'যখ' দেওয়ার লোভ হয় শোনা যায়,

তেমনি আমাদের এই পুরুষানুক্রমিক পদের মোহ ধনের লোভ আমারও কেমন মনের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। তোমাকে দেখে মনে হল, তোমাকে আমার পদের উত্তরাধিকারী করতে পারব।[৮]

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির মতো নূরনেহারের ভাইঝি গুলসুরৎ তার দুটি পুত্রসহ খুশনজরজীর কাছে আশ্রয় নিতে চাইলে তাঁর মনে আবার যখের ধন আগলাবার ইচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে। তাঁর সিদ্ধান্তে আপত্তি ছিল না গুলসুরৎ এবং খোদাবক্সের। গুলসুরৎ তার দুটি পুত্রের মধ্যে অন্তত একটিকে দিতে রাজী ছিল। কিন্তু আত্ম-জাগরিত বোধের তাড়নায় খুশনজরজী সমস্ত প্রত্যাশা ও দাবি ফিরিয়ে নিয়ে বললেন– 'বেটি, ছেলে তোমার দুটি জানি। কিন্তু ওদের জিন্দেগী' তো একটি করেই! ...ঐ চমৎকার সুন্দর শিশু বড়ো হয়ে যখন সকলের মতো জীবনের সুখ আশা কল্পনা আনন্দ খুঁজবে, তুমি দিতে পারবে কি? আমি কি পেরেছি দিতে?[৯] কিন্তু বিবেক বাধ সাজে। মাথার ভিতর কাজ করতে থাকা বোধের তাগিদে আর নিজের না পাওয়ার অভাব মেটাতে তাই তিনি আবার আর একটা স্বাভাবিক জীবনকে পঙ্গু বানাতে চাননি।

খুশনজরজী খোদাবক্সের মায়ের ভাইঝি গুলমোহর ও তার দুই পুত্রকে অভিশপ্ত দৌলতখানা থেকে মুক্তি দেন। গরিব হলেও তারা মানুষের মতো মানুষ হোক, এই তাঁর কামনা। খুশনজরজী নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছেন ঐশ্বর্য নয়, মানবিক গুণ আর স্বাভাবিক জীবনই মানুষের সবচেয়ে বড়ো সম্পদ। সর্দার খোজার আত্মোপলব্ধির অসামান্য বয়ানে রচিত গল্পটির শেষে খুশনজরজীর বঞ্চনা ও দীর্ঘশ্বাস অনুরণিত হয়ে ব্যথিত করে তোলে রসজ্ঞ পাঠকের মন। তৃপ্তিহীন কামনায় অবিবেচক রাজন্যবর্গ হারেমের আড়ালে অজস্র বন্দিনীর গর্ভে, পুরুষানুক্রমে এক অসাম্মানিক সন্তান-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেছিল। রাজার অবৈধ পুত্র লালজীসাহেব আর অবৈধ কন্যা বাঈজীলাল। জীবনচক্র বজায় রাখতে বিভিন্ন রাজ্যের লালজীসাহেব, বাঈজীলালদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক জারি ছিল। অপরিণামদর্শী পূর্বপুরুষের মতো এই লালজীরাও কেবলমাত্র যৌনলালসা আর ধনপিপাসা চরিতার্থতার মধ্যেই 'এমন মানব জমিন'কে অনাবাদী, পতিত করে রেখেছিল।

কেশরবাই এক সাধারণ বাঁদী। তবে দুর্ভাগ্যের মধ্যেও হাজার হাজার বন্দিনী নারীর তুলনায় ব্যতিক্রমী সৌভাগ্য নিয়ে জন্মেছিল সে। তাই রাজ-অন্তঃপুরের বিবাহ বহির্ভূত রমণীদের কাঙ্ক্ষিত পদমর্যাদার স্তরগুলি একে একে অতিক্রম করে ক্রমে 'সুমেরুরায়' খেতাবধারী পাশোয়ানরূপে মহারানির পরবর্তী পদমর্যাদার অধিকারী হয়ে উঠেছিল সে। তবু রাজ-অন্তঃপুরীয় প্রথানুসারে তাঁর পুত্রেরা 'লালজীসাহেব' এবং কন্যারা 'বাঈজীলাল' হিসেবে চিহ্নিত হয়। এই সব পুত্র-কন্যাদের সাম্মানিক পদমর্যাদা থাকলেও তা ছিল কেবল রাজপ্রাসাদের সীমানায়। রাজমহলের বাইরে সমাজের চোখে ওরা অসম্মাননীয়, 'নাজায়েস্ অওলাদ্'।

প্রেয়সী পুত্র, বালক লালজীসাহেব, সুজনসিংহের মৃত্যুতে রাজা আন্তরিকভাবেই, প্রকাশ্যে বেসরকারি শোকের দরবার বসিয়েছিলেন। বৃদ্ধ রাজার অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে, সৌজন্য-সাক্ষাৎকারে এসেছিলেন শ্বেতাঙ্গ রাজদূত, রেসিডেন্ট সাহেব। শোকার্ত রাজা সাগ্রহে মৃত পুত্রের ছোটো ভাই সমর সিংহকে রেসিডেন্টের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। মন্ত্রীর ইঙ্গিতে সমর সিংহ সাহেবকে যথোচিত সম্ভাষণও জানান। কিন্তু সে যে রাজ-বাড়ির সীমানার বাইরের লোক, বাঁদীপুত্রের পদগত অসম্মাননীয় অবস্থান তাঁর জানা। তাই রাজার নজর এড়িয়ে সমরের অস্তিত্বকে উপেক্ষা করে তিনি পালটা সম্ভাষণে হাত বাড়ান না। অবমাননার বেদনা গ্লানি এনেছিল বালকের মনে, যা কোনওদিনও ভোলার নয়। এরপর কেটে যায় অনেক বছর। পুরোনো ব্যাথায় সময়ের পলি পড়ে। সেদিনের সমরসিংহ এখন মধ্যবয়সী লালজীসাহেব, প্রচুর সম্পত্তি আর অনেক সন্তান নিয়ে ঘোর সংসারী। সকলে মিলে ফেলেছেড়ে খেলেও সম্পত্তি শেষ হবে না। কিন্তু রাজকীয় বিধান অনুসারে পুরুষানুক্রমিক বৈভবের ভার এবং ভোগে শুধু জ্যেষ্ঠের অধিকার।

কনিষ্ঠ সমুদ্রসিং লালজী বংশে বিরল ব্যতিক্রম। ধনে নয়, জ্ঞানে তার আগ্রহ। অনধিকারীর ধন নিয়ে মাথা না ঘামানো সমুদ্রসিং ম্যাট্রিক পাশ করার পর স্বপ্ন দেখে ঠাকুর সাহেবদের ছেলেদের মতো আজমীর কলেজে পড়ার। বংশানুক্রমে তাড়া করা অবমাননা খানদানি কলেজে পড়ার সুযোগ দেয় না তাকে। সমুদ্রকে দেখে পিতা সমরসিংহ-এর পুরোনো ব্যাথা থেকে পলি সরে যায়। কৌশলে তাকে ভর্তি করে দেওয়া হয় স্থানীয় কলেজে। বুদ্ধিমান সমুদ্র বোঝে হারেমের পাপ হারেমের বাইরের জীবনকেও সামাজিক দিক থেকে কতটা বিপন্ন

করে। নীরবে ভেতরে ভেতরে নেওয়া সিদ্ধান্ত আরও বলিষ্ঠ হয়।

সময় তাকে আরও বোঝায় যোগ্যতা থাকলেও কোনো বড়ো পদে চাকরি করার অধিকার তাদের নেই। উন্নতির পথ রুদ্ধ এই পরিবেশে জন্ম-পরিচয়ের গ্লানি বহন করে সে আর হীনমন্যতায় ভুগতে রাজি নয়। তাই ব্রিটিশ ভারতের সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে সে বদ্ধপরিকর। ছেলেকে ঘরে বাঁধবার জন্য পিতা বিবাহের যৌতুকে ভোলাতে চান। ঠিক তখনই তার জেহাদি সিদ্ধান্ত জানা যায়। ব্যঙ্গের হাসি হেসে নিয়তি বদলানোর দুঃসাহস দেখিয়ে সমুদ্র ঘোষণা করে— 'বাঁদী-সন্তানের, দারোগাদের (রাজপুতদের দাসীপুত্র) দুঃখ-লাঞ্ছনা তো আপনি স্বচক্ষে দেখলেন, আর তাদের বংশবিস্তার করে কি হবে? আমি যৌতুক লক্ষ টাকা পেলেও আর কোনো রাজ্যের বাঈজীলালকে বিয়ে করলে আমার ছেলে-মেয়ে বাঁদীর সন্তানই থেকে যাবে।'[১০] পিতার আহ্বান, ঐশ্বর্যের মোহ এবং সুন্দরী পত্নীর আকর্ষণকে পরিত্যাগ করে সে যাত্রা করে বৃহত্তর পৃথিবীর পথে, যেখানে সে পরিচিত হবে মানুষের পরিচয়ে। যে অবমাননা বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছিল সমরসিং! সমুদ্রসিং-এর শিক্ষিত মন তা মানতে নারাজ। সমুদ্রসিং তার না করা অপরাধের অভিশাপ থেকে তার না হওয়া সন্তানদের মুক্তি দিয়ে যায়!

বদলানো সময়ের জাতিকা জ্যোতির্ময়ী এই নতুন হাওয়াটাকেই ধরে ফেলেন। রাজতন্ত্রের ঐতিহ্য, বীরত্ব, ক্ষমতার আড়ালে তিনি পরের পর আবিষ্কার করে চলেন বদলাতে চাওয়া আকাঙ্ক্ষার ইচ্ছেডানাগুলো। জ্যোতির্ময়ীর গল্পে চেনা রাজপুতানার সমান্তরালে রচিত হতে থাকে এক 'বিকল্প ইতিহাস'। সেখানে বীর রাজার উত্তর পুরুষেরা অলস-আবিল যাপনে ব্রিটিশরাজের পুতুলে পরিণত। উজ্জ্বল দিনের সমাপ্তিতে রাত নামে আর রাতের শেষে আসে নতুন ভোর। জ্যোতির্ময়ী সেই নতুন ভোরে প্রথম আলোর পথযাত্রীদের গল্প বললেন। তাঁর রচিত বৃদ্ধ খুশনজরজী তাই মুক্তি দেন গুলসুরৎ-এর সন্তানদের, লালজীসাহেবের বংশধর সমুদ্রসিং প্রথা ভেঙে মানবজমিন আবাদ করতে নামে। রাজপ্রাসাদের মধ্যযুগীয় বর্বরতার অন্ধকার কেটে গিয়ে একটু একটু করে আধুনিক মানবতার আলো ফোটে— আরাবল্লীর আড়ালে লেখা হয় নতুন আরাবল্লীর কাহিনি।

তথ্যসূত্র

১। ''লেখিকার নিবেদন'', 'জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা-সংকলন', দ্র. সুবীর রায়চৌধুরী (সম্পা), ২য় সং, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, সেপ্টেম্বর ২০০১, ১ম খণ্ড, পৃ ৩৫৪

২। ''স্মৃতি-বিস্মৃতির তরঙ্গ'', 'জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা-সংকলন', গৌরকিশোর ঘোষ (সম্পা), ১ম সং, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ১৯৯৪, ২য় খণ্ড, পৃ ৫০৮

৩। তদেব, পৃ ৫১০

৪। ''অত্যাচার শাস্তিদণ্ডের অনাচার প্রসঙ্গ'', 'জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা-সংকলন', গৌরকিশোর ঘোষ (সম্পা), ১ম সং, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ১৯৯৪, ২য় খণ্ড, পৃ ৩৪৩

৫। তদেব, পৃ ৩৪৫

৬। তদেব, পৃ ৩৪৭

৭। তদেব, পৃ ৩৮৮

৮। ''খুশনজরজী'', 'জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা-সংকলন', গৌরকিশোর ঘোষ (সম্পা), ১ম সং, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ১৯৯৪, ২য় খণ্ড, পৃ ৭৬

৯। তদেব, পৃ ৭৯

১০। ''লালজীসাহেব'', 'জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা-সংকলন', গৌরকিশোর ঘোষ (সম্পা), ১ম সং, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ১৯৯৪, ২য় খণ্ড, পৃ ৮৮

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

Hey Oldie...

Nageswar Singh

Hey oldie,
Its been a year since I left you and haven't felt the same post that. I miss you. I miss you in the mornings when I wake up and the sun rays don't hit my face from your east facing window. I miss your shallow green walls, I used to open my arms wide and get stuck to them in the mundane, humid summer afternoons because they were cold and cosy. I miss those window panes on which me and my sibling used to sit for hours in the evening which later on accomodated all our accessories when we grew up.

We have now shifted into a new flat in a near by alley, more spacious, more luxurious and ofcourse modern. I remember how the four of us used to adjust into that small room of yours. We did quite well to live a couple of decades of our life there. I have heard from maa that when we moved into that room of yours , I was in her womb, I have a connection with you even before I was born, you see.

I remember chatting with myself in that small, shabby washrooms of yours. Starting form the homeworks I couldn't complete to every heartbreak of mine, I collected all my thoughts there, while sitting in the Indian style commode of yours. The flat has quite a big washroom as compared to yours but there I can't even express myself to myself. We have a shower there to take a bath but what I really miss is the open air baths in the long 'Dalan' of yours with birds chirping all around, cool breeze giving me a shiver everytime I finish it off with.

A couple of large bedrooms there aren't as comfortable as the small cabinet sized one of yours. When I lie down there at night I don't get to see that half broken roof of yours and that ancient pre-independence ceiling fan. That fan made a horrible sound through out the time it was switched on but it never really hit my ears, probably because I was hearing that since my birth or even before that through my mother's. The modern fan there doesn't make any sound and that's what feels absurd to me.

I could never think of any other place which I would call home. Even today if I visit you for an hour to soothe my soul I say maa that I'm going home. I never called my ancestral house in Bihar, my 'home', although I loved it dearly, because I could never relate to it the same way I related to you.

You were a great teacher as well. You taught me how to stand tall despite all the difficult times we face and protect people who take shelter under us. You taught me how to preserve secrets and let no one else know about them, you have many of mine to keep. Standing tall from the British age, I hope you are there till eternity.

Yours homesickly,
A homie

6th Semester, Department of Commerce

Indian Films at the Oscars: A String of Cursory Takes

Shreyam Sen

Having gone through a lot of debates and uneven criticisms, the topic of the official submissions to the Oscars from India has become a subject of plain avoidance and daft humour. Last week I've had revisited some films like Another Round, Ida, A fantastic Woman, Tsotsi, A Hero and a couple of flicks more. I hadn't intended to doubt whether these were some of the examples of good film making, but it had made me a bit sceptical about the broadcasts made in India. India hasn't been unsuccessful in making films that Oscar-worthy contents. Our films have been screened at the Cannes Film Festival, Berlin International Film Festival, Venice International Film Festival and Toronto International Film Festival. Questions are normal to crop up inside heads that what exactly is captivating us towards the wrong turn whenever the path to the Academy Awards has been laid out. The subject matter hasn't been left open ended for everyone yet it's a question that everybody ponders over - why are Indian Films bogged down at the Oscars?

However, India, despite offering it's hand to the Oscar Awards, hasn't achieved anything yet. India is the only country in the globe whose Industry produces more than two thousand feature films in a year. As of the rest of the continents of Europe and America, they give birth to six hundred to seven hundred films. Inspite of having a mammoth number of films, there are plenty of hang ups that no one tends to work on. The selection of the right film has always been a subject of controversy. The film to be sent to the Oscars as the official entry has always been the bone of contention for people who are tasked with it. The organisation or the committee who is to select the best film as the official entry to the Oscars from India, is called the 'Film Federation of India' (FFI). However, questions may arise about them celection of films. Back in 1998, the jury members chose Jeans over a classic like Satya by Ram Gopal Verma as the official submission to the Oscars. This commercial film, starring Aishwarya Rai and Prashant, was an entertaining film made for the masses and surely wasn't an Oscar worthy content. One of the jury members of the Academy jestingly said that probably India thinks it's a joke. In 2005, the FFI went for Peheli as the official film which again drew a lot of criticism. Directed by Amol Palekar, the film starred by Shah Rukh Khan and Rani Mukherhee in lead roles. The film is about a village girl who's juggling between her emotions and her responsibilities and how a soul comes to comfort her. A ten members jury of the FFI chose this film over fifteen other potential nominees that included Iqbal, Page 3, Veer-Zaara, Parineeta, Black and Swades. People used harsh words against Bollywood stating that the industry takes

the side of big names. People felt that Black deserved to be the film, but my take is that Black wasn't something of a film reflecting much of India. In all probability, this was the reason for Black getting rejected even at the Cannes. But Iqbal and Veer-Zaara were unquestionably the fitter films for Oscars. Veer-Zaara managed to put it's head among the top sixty films of the Golden Globes Awards that year, but it couldn't make it to the finals. In 2007 again, the FFI jury made Eklavya: The Royal Guard the lucky winner. The film gives an account of a royal guard Eklavya, played by Amitabh Bachchan, who has spent a lifetime in serving the royals, but his aging leads him to blindness and his heir, played by Saif Ali Khan, needs to take over him. Directed by Vidhu Vinod Chopra, the film does not get out of the shadow of it's mediocrity and till date remains a 'just fine' watch. The four other strong contenders that year were Chak De India, Gandhi; My father, Dharm and Guru. Personally, even I believe that Dharm could have been a more satisfactory choice. It was a superbly shot film with great technical aspects and astounding performances. Eklavya got more negetive reviews than acknowledgement in India itself. It was nothing but a lame idea for the jury to think that the Academy would give it a high praise. Many insiders trolled this decision and questioned the calibre of the committee.

India intermittently got mortified in the eyes of the Academy. But the FFI did not stop making the scenario too ugly. In 2013, Ritesh Batra's film The Lunchbox fetched a rain of compliments from all across the globe. The film gained sky high appreciation at the Cannes Film Festival and even got a standing ovation from the audience at the festival. "The Lunchbox' follows the story of two strangers, getting to interact each other by means of a wrongly delivered lunchbox. A housewife, played by Nimrat Kaur, who doesn't have a good impression about her married life, sends toothsome edibles in a lunchbox to her husband on a regular basis. The plot opens it's eyes when the dabbawala unceasingly starts taking it to the wrong person, played by Irfan Khan who is a widower, sunk in depression and it is then that they start sending letters to each other and we see the sharing of a bond. The deep method of communication that envelops the film is what makes it so distinctive in it's genre and sensitibility. Although we get a voiceover of the two characters when they read each other's letters, there's no word of mouth because the two characters never meet. The emotions of these two figures pierce straight through our hearts. The thunder went louder when Annie Thompson, an influential critic of the 'Indiewire' said that this film has heart. The film crossed all it's boundaries of success and even attracted the attention of the 'Sony Picture Classics' which agreed to campaign the film for the Oscars, because the film earned a gargantuan recognition at the Toronto International Film Festival(TIFF). The Industry insiders and niche audience turned to optimism that India was to win it's first Oscar Award. However, they forgot that the decision lied in the hands of the FFI's jury. Once again, the FFI fumbled up the entire thing. They believed that the The Lunchbox was a film that everyone had thier assumptions on and that it had a great chance of winning, yet they chickened out at the last moment and selected a Gujrati film, The Good Road as the official entry. This grotesque situation shattered all hopes and broke many

expectations. Few celebrities displayed their resentments against the committee saying that the nation lost a golden chance of winning and that there was nothing they could do. The Good Road could not make it to the final five which was quite obvious. The Good Road was a very obscure film but preferring it to a masterpiece like The Lunchbox is a hard pill to swallow. No statement in defence of the FFI countered proper reasoning and that it was a ‘beyond guess’ decision. Supran Sen, the Secretary General of the FFI, dismissed the matter saying that The Good Road was “a unanimous decision”. The names of the jury members weren’t disclosed that year because it was surely a very tentative step from the FFI as they themselves knew that The Lunchbox stood a better chance of deserving. There has even been accusations against the FFI that the appointed jury members banter among themselves about the shortlisted films and do not take the load seriously.

There had been much bickering among the selected jury members over the work process for the years 2015 and 2017. In 2015, India’s entry was Chaitanya Tamhane’s Court and in 2017, we had Newton by Amit Masurkar for the Oscars. Complaints for lobbying and internal politics had been registered against the jury members. India’s Oscar history even drafts plagiarized contents being sent to the Academy. In 2012, the FFI stuck to Barfi by Anurag Basu and submitted this film to the Academy for the Oscar race. Turning back the clock to that year, while the masses genuinely enjoyed the film and found that to be a very scintillating side of Hindi mainstream Cinema, this film caused a bitter dissension among the professionals. Almost every quarter of the film was a scene by scene copy of few Buster Keaton and Jeremiah Chechik films. In 2012 we had much better options like Kahaani, Gangs of Wasseypur 1 and 2, Paan Singh Tomar, Ferrari ki Sawari and The Dirty Picture that lost out to a film like Barfi that was stemmed to unoriginality. Accomplished films like Vicky Donor and Shanghai weren’t even shortlisted that year. 2019’s official entry for the Oscars from India was Gully Boy by Zoya Akhtar. The film, although garnered much support and appreciation, no one could mistake it for something meant for the prestigious Academy Awards. The exposition to the fact that Gully Boy had numerous scenes copied from Eminem’s ‘8 Miles, lead many people to voice their negative opinions. Aparna Sen, who was the Chair person of the committee that year, made an ironical settlement by not breaking the convention of preferring a mainstream commercial Bollywood film, as earlier she affirmed once that the FFI does not scrabble about Regional Cinema and only brings famous personalities to the forefront. She had chosen Gully Boy over brilliant and praiseworthy films like Super Deluxe, Badla, Olu, Nagarkirtan and The Tashkent files. The rules state that even if one member gets to know about a plagiarized film being sent from any country, the entire panel rejects the film and they do not even feel necessary to give it a watch. Gully Boy was a plagiarized motion picture, quite overrated, and because it was so, the result was nil again. People at that time howled at this failure and to satisfy thier egos, said that the film doesn’t need the approval of the Oscar.

Throughout years, the FFI hasn’t maintained a safe distance from controversies. But the FFI selected and sent some brain melting films to the Oscars. Digging into the facts, Lijo Jose Pellisery’s Jallikattu and PS

Vinothraj's Koozhangal (Pebbles) were India's entry to the Oscars for the last two years. It brings everyone to a very important question - Is it only because of the indiscretion of the FFI that we are missing out on the Oscars? The ansaer should be in the negative. The word 'Campaign' has been placed after Oscar for a reason. What we see is the ceremony on stage but the trade-ins that it includes is always invisible. Sending the film is the tyro thing. What needs to be done in the second place is allowing extravagancy relating to the film that needs to be promoted in abvoad. Indian director don't have deep pockets and the issue starts here. The Oscar jury members are in zillions, and the film needs to reach them beforehand. A jury member cannot be given a pendrive or a disk, neither can he watch it on his personal device. The director of the officially selected film needs to spend good money to market it out in the US and arrange screens for every member to see it, which is steep enough to break his bank. If we travel back to the year 2004, the Marathi film Shwaas was selected as the official entry to the Oscars. The film was labelled as a masterpiece by many critics and reviewers. The plot of this musical drama encircled around a village boy, suffering from retinal cancer, whose physical conditions allow him to stay alive only if he stops seeing. His grandfather takes a step and tries to make him realise that even with a damaged sense organ, life can be led beautifully and to think of this disability as a blessing. Screening at various film festivals has always been a central concern for nominations at the Oscar. The director of the film Sandeep Sawant, was incognizant of the pricey process of screening the film at various film festivals and was in no position to stockpile so much of funds. Celebrities who praised the film after watching it did not show any heed. Amitabh Bachchan, whose earning speaks in crores, only slipped out rupees two lakhs to prove his so called support for the film. With that much of funds, the film only could be screened at two film festivals. Shwaas, that year remained a whisker away from being nominated among the final five and was counted on number six. Had more funds been invested and support been given, Shwaas could've been our first Oscar win. In 2018, we had the stupendous film Village Rockstars headed for Oscar campaigning. The director of the film, Rima Das, asked everyone for funds to pass through exorbitant stage but no one indulged themselves in helping the filmaker.

Mehboob Khan's Mother India, Mira Nair's Salaam Bombay!, and Ashutosh Gowa rikar's Lagaan - these are the three films that made it to the final five nominations. It's been more than two decades even a single film from our country could not have it's name announced on the Oscar stage. None of our films could even get shortlisted among the fifteen films that the Academy makes, out of which the final five are selected and ten are left out. The matter does not end here and it's a topic that is everlasting. There's no denying that there are great cinimas in our country, but there's also no denying that people in our country aren't infatuated with good cinema. There's still a bigger percentage of audience who flock to the theatres only because of the superstars and avoid binge-watching films that are grounded to reasons and logic. We, as audience cannot strive for a cure. But, we can definitely support good films which can render a wave of the purest form of Indian Cinema. Only putting curtains on our faults,

and underlining Awards and Film Festivals as some hoax and "we don't need those" isn't going to land us anywhere. We should start watching good films, the Government can provide funds to filmmakers to meet the promotional requirements, everyone can go for crowdfunding and dozens of other ways. In this era of OTT platforms, regional films are indeed grabbing many eyeballs, and people are getting to see prominent films with fresh concepts. It's time that responsible organisations start sinking their teeth into good scripts, analyse indefectible screenplay and prefer inventive plots and storylines to drag the blurred India into the map of World Cinema once again.

4th Semester, Department of Commerce

মন, মস্তিষ্ক আর ইত্যাদি...

সন্তু মুখোপাধ্যায়

কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক হওয়ার সুবাদে, দিনরাত্রি ছাত্রদের অনুষঙ্গেই কাটে। ফলত ওদের দুষ্টুমি, ভাবনা, চেতনা, স্বপ্ন, প্রতিভা, সাফল্য, ব্যর্থতা, গ্লানি, সংশয় সবকিছুরই খুব কাছাকাছি থাকার এবং প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য ঘটে নিত্যদিনই। তবে সাম্প্রতিক সময়ে কোভিড-পরবর্তী রুগ্ন সমাজের চেয়ে ওদের মানসিক অভিব্যক্তি আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে বেশি। জীবনযুদ্ধের কঠোরতা আর মন, মাথা ও মস্তিষ্কের মধ্যে অস্পষ্টতার ভ্রূকুটি ওদের সহজ সাবলীল জীবনযাত্রাকে একধাক্কায় বেশ খানিকটা জটিল করে দিয়েছে। এক অজানা অথচ দৃঢ় আশঙ্কা গ্রাস করেছে ওদের নির্মলতাকে। বোধ করি এবার সময় এসেছে ভেবে দেখার। চারিপাশে ফুটে থাকা এই আগামীর উজ্জ্বল অঙ্গীকারগুলোকে যত্ন করার। মাঝে মাঝে মনে হয় কে যেনো এক অলৌকিক উপায়ে আমাদের সকলের মন, মাথা আর মস্তিষ্কগুলোকে একসাথে সম্মোহিত করেছে; আর বাধ্য করেছে বৃহতের মাঝে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীর্ণতাকে আঁকড়ে ধরতে। আমরাও সুবোধ বালকের মতো সেই কাজ পালন করে চলেছি। আসলে আমরা ভাবতে ভুলে গেছি। ভুলে গেছি সূক্ষ্ম অনুভূতির স্নেহময় স্পর্শটা ঠিক কেমন। আমাদের মনে যে আদি অনন্তের প্রবাহ, তা আজ অনুভবের স্নিগ্ধ বর্ষার অভাবে মরুভূমিতে পরিণত। মস্তিষ্কের লৌকিক বর্বরতা আমাদের পেয়ে বসেছে। মাথা নির্লজ্জতার আর অজ্ঞানতার অবগুণ্ঠনে আচ্ছাদিত; খানিকটা প্রায় শেষ হয়ে আশা বেসুরো সঙ্গীতের মতো। তবুও যেনো তার রেশ কাটতে এখনও অনেক দেরি। আমরা যারা সমাজের এই বেসুরো সঙ্গীতের ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত শ্রোতা, তারা নিজেদের বোধোদয়ের স্বরলিপি হারিয়েছে বহুদিন। এমতবস্থায় মন, মস্তিষ্কের এহেন দুর্দশা কাটাতে অন্তরে থাকা সেই ছোট্ট 'আমি'-টাকে আমাদের ফিরে পেতে হবে। নতুনের জানালা দিয়ে খুঁজতে হবে সেই শৈশবকালীন কৌতূহল, প্রশ্রয়, জিজ্ঞাসা, অনুসন্ধিৎসা আর বোকামি। হাসির দমকা হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে হবে অযৌক্তিক ভয়। হঠাৎ কান্না পেলে, চোখের আলপথে গজিয়ে ওঠা একাকীত্বের আগাছাগুলোকে সমূলে উপড়ে ফেলতে হবে। বাস্তবের চোখ-রাঙানিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে গড়ে তুলতে হবে অপরাজেয় ইমারত। আসলে না হেরে, জীবনের প্রতিটি সন্ধিক্ষণে বুক চিতিয়ে টিকে থাকার মধ্যেই জীবন ও জীবিতের প্রকৃত মাধুর্য। একে অন্যের জীবনে হয়ে উঠতে হবে ভালোবাসার পরিপূরক। নিজের দৃষ্টিভঙ্গিকে করতে হবে মুক্ত বিহঙ্গের মতো। ব্যর্থতা আর সাফল্য আপেক্ষিক মাত্র; তাই জীবনবোধের রঙ্গমঞ্চে এদের উপস্থিতি ক্ষণিকের। ভুলে গেলে চলবে না, আমাদের ঘিরে থাকা প্রিয় মানুষগুলোর কথা; তাদের বিশ্বাস,ভরসা ও আবেগের কথা। ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, স্মৃতি, মূহুর্ত, ঘটনা, সমালোচনা - এই সবকিছুই বয়ে চলেছে খরোস্রোতা নদীর মতো আবহমান কাল ধরে জীবনখাতের মধ্যে দিয়ে। উপেক্ষা নয়; গ্রহনযোগ্যতার উদারবাদী প্রকোষ্ঠে স্থান দিতে হবে সকল বৈচিত্র্যকে। দ্বন্দ্বের পথে মন আর মস্তিষ্কের দূরত্ব কমিয়ে গন্তব্যের আকাঙ্ক্ষা ছাড়াই হয়ে উঠতে হবে অক্লান্ত পথিক; আর এখানেই জীবনের সার্থকতা।

আমার সকল ছাত্র-ছাত্রী, বন্ধু ও সহকর্মীদের প্রতি আমার আর্জি এই যে, বর্তমানের বিভীষিকাকে ভয় না পেয়ে, ভবিষ্যত জীবনের প্রতি নমনীয় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং যা আছে, যতটুকু আছে সবটুকুকে নিজের বৃদ্ধ হাতের তালুতে সঞ্চয় করুন। দেখবেন চাইলেই ভালো থাকা যায়। শুধুমাত্র একটা কারণ-ই যথেষ্ট। মন আর মস্তিষ্কের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা যাবতীয় ইতিবাচক প্রবণতাই আমাদের বাঁচিয়ে রাখে এই নির্মম পরিহাসের পৃথিবীতে।

যুদ্ধে জয়ী সেই, যে অর্থ লেখা আছে অভিধানে–
যে মানুষ না হেরে প্রতিবার লড়ে যেতে জানে।।

সরকার পোষিত কলেজ শিক্ষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

The City of Lights: Varanasi

Krishnanshuk Saha

Varanasi, the name derived from the rivers Varuna and Assi, is also known as Banaras and Kashi. It is fondly known as the City of Lights. It has a spiritual history connected with Hinduism that dates back over 3000 years and is rightly referred as one of the oldest cities of the world. An eclectic mix of spirituality, tradition, culture and more, there is something that will appeal to everyone irrespective of caste, creed or religion. Here, I would describe a perfect day in Varanasi.

Magnificent Morning

It is 5:30 AM, first week of December. The air is quite cold and dry as we are at the Assi ghat to see the morning arati. Amidst the dark, seven priests came with a myriad of prayer items, getting ready to start the arati. The prayers first dealt with the offering of fire and flowers to Maa Ganga. The synchronized ritual is a stunning spectacle that inspires awe and spirituality at one shot. Young children were also encouraged to sing here as well. It was a part of a lovely event, called "Subah – e – Banaras" or morning in banaras.

You could gradually see the changing colours as the sun creeps through the clouds and mist. The river Ganga looks like a beautiful portrait of brilliant yellow hues. After this, we took a stroll down the ghats of Banaras till Dashashwamedh Ghat. We simply saw the morning unfold in Banaras within two hours from the start of our day. People took dip in the cold and holy water of the River Ganges, some were jogging down the ghats, while swans were wading down the placid river waters, foreigners clicking photos of the ghats e.t.c.. It felt like a silent paradise, away from our bustling urban lifestyle. You could witness how people soak up the lively atmosphere at the ghats.

We entered Kashi Vishwanath Temple via Vishwanath Galli. There is heavy security at the temple. Several items including electronics are strictly restricted inside the temple premise. After paying obeisance to the presiding deity, Lord Vishwanath, over there, we headed out to have a lip smacking breakfast at Kachori Galli. It is only a five minutes walk from the temple. We had an exemplary Kachori-Sabzi along with lassi to soothe our already hungry stomach. You could see locally made handicrafts being sold all over Varanasi. It could be an ideal souvenir to cherish at your home.

Delightful Noon: Exploring the History of Ghats

In noon, we had an extraordinary lunch at a Japanese Café, which served authentic Japanese cuisine. These cafes are primarily run by some Indo–Japanese people who

Viswanath Temple in the BHU

stayed in Varanasi after they fell for its charm. The lifeline of Varanasi is however, on its ghats. If you want to experience the pulse of the city, then head to one of its eighty-eight ghats along a 7.5 Km long river bank. The ghats start from Kashi Bridge till Assi Bridge and forms a crescent shape along the Ganges. It is often said that this crescent shape of ghats along the River Ganga, represents the Crescent Moon on Lord Shiva's head. During the death years of Mughal Empire, Aurangzeb decimated the Kashi Vishwanath Temple and ghats adjoining it, primarily due to ever lasting communal violence in India. In 18th Century, the ghats were built under the patronage of the Marathas.

We witnessed cremation at Manikarnika Ghat, where it is said that the pyres have been burning for last three millenia. Though the people and relatives of the deceased look quite satisfied as it is believed that by performing the last rites of the departed soul here, will confirm their Moksha (Freedom from the Cycle of Birth and Rebirth). It is also a stark reminder of the cycle of birth, death and rebirth. Do not forget to visit the Scandia Ghat, which has a tilted Shiv Mandir. It has more tilt than the Leaning Tower of Pisa in Italy. It is said that Agni, the God of Fire was born here at this ghat. Hindu Devotees pray at Vishveshwara Temple for a son.

From here, we visited Banaras Hindu University (BHU). My visit was intended for an admission to its famous Geography Department. I was astounded by the beauty of the campus. This 1300 acre campus has 30000+ trees, which makes it like a forest. Inside the BHU campus, there was a complete silence, while just outside the campus was the infamous chaotic traffic of Varanasi. They have specific buildings, dedicated to specific department. I visited BHU Vishwanath Mandir, which is even more magnificent than the original ones. I could assure that it is one of the most beautiful educational institutions of India you could visit.

Charming Evening and Gorgeous Night

Now, comes the most exciting part of the day – Evening. As soon as the Sun goes down below horizon, the city itself becomes an epitome of chaos–yet beautiful and vibrant, oozing out the charms of its spirituality. We again took a stroll down the ghats to Dashashwamedh Ghat, to see the famous Sandhya Arati [Evening Prayer] on the banks of the River Ganges. This is the most important daily ritual of the city. Seven priests come out with conch shells, brass plates, brass lamps, bells and other devotional items to be used for the ritual. The boats near the ghats charge 100 to 150 Rupees for seating! Such is the craze for witnessing

this event. The 45 minute event is included with devotional bhajans, which is followed by the lighting of lamps in 5kg brass. This synchronized event is such an alluring one that it will make you feel to stay in the city just to watch this everyday. Chants of "Umapataye Har Har Mahadev" were echoing in the dark waters of the Ganga in evening.

We visited the local weaving units, where you can see how master craftsman work on the traditional handloom to create the world famous and beautiful Banarasi Silk Sarees, Scarves and home décor. With so many myriad experience the hustle bustle at one end and serenity at the other, it seems like life does come full circle here. We then visited Kaalbhairav Temple and prayed there for wellbeing. At last, we visited a Korean Café and had a sumptuous dinner before winding upto our hotel bedroom. Our bedroom had an attached terrace, where I stood and enjoyed the views of the Ganges and the Ghats of Banaras. I casually gave a glimpse to my smartwatch, which showed that I had walked 18kms on that day–my personal record. This shows that visiting Varanasi is not a one-day affair. It requires nearly a week to visit a meagre portion of this enchanting city.

Places to visit nearby Varanasi

- Sarnath: The place where Lord Buddha served his first Sermon. This archaeological site is 10 Kms from Varanasi (Godowliya).
- Chunar Fort: It is the fort where Afghan Ruler Sher Shah attacked, forcing Humayun to flee by jumping in the River Ganges. It is also famous in Hindu Mythology as the first place of Lord Vishnu's incarnation. Lord Vaman placed his holy feet after getting permission from King Bali to acquire "3 feet of land" . This place was thus called "Charanadri", which later took the short form of Chunar. This place is 45 km from Varanasi. Railway station is in Chunar (2 km).
- Vindhyachal: A Hindu Pilgrimage site near Mirzapur, Uttar Predesh. It is dedicated to Goddess Vindhyavasini. It offers great view of the River Ganges. It is around 70 kms from Varanasi. Major nearby railway station is in Mirzapur (10 kms).
- Prayagraj (Formerly known as Allahabad): It is a holy place where the River Ganga and Yamuna meet with mythical the River Saraswati. Kumbh Mela, the largest human gathering on earth takes place here. It is 120 kms away from Varanasi. Nearby railway station is Prayagraj Junction, with other satellite stations like Subedarganj, Prayagraj Chheoki, Prayagraj Rambag and Naini.

The River Ganga from Kedar Ghat

2nd Semester, Department of Geography

Defence Mechanism

Soumi Hazra

Human beings are social beings. Every human being seeks adjustment to various situations. He constantly makes efforts to adjust himself to his surroundings because wholesome adjustment is essential for leading a happy life and gaining satisfaction. There are many situations in which the individual is not able to find out solution to his problems, and this causes other frustrations and conflicts. In such a situation the individual adopts various adjustment mechanisms which are also known as defence mechanism to save himself from frustrations and conflicts. Defence Mechanisms are psychological strategies that are unconsciously used to perfect a person from anxiety arising from unacceptable thoughts or feelings.

The term "Defence Mechanism" was first used by **Sigmund Freud** in his paper **"The Neuro- Psychoses of Defence" (1894).** Anna Freud (Daughter of Sigmund Freud) developed the ideas given by Freud and elaborated them.

Sigmund Freud was first psychoanalyst who propose the idea of Defence mechanisms. Freud believed people unconsciously used Defence mechanisms to help protect themselves from difficult or uncomfortable thoughts, feelings or situation. According to Freud, anxiety is an unpleasant inner state that people seek to avoid and Human use defence mechanisms to deal with problems anxiety and self-esteem issues. When anxiety occurs human mind first respond by increase in problem solving thinking, seeking rational ways of escaping the situation.

Defence Mechanisms are unconscious and operate at the unconscious level. Defence Mechanism are not healthy method to cope with anxiety and stress as they are an unrealistic approach to problems. These are unconscious coping mechanisms that reduce anxiety generated by threats from unaccepted impulses.

Psychologists have classified different defence mechanisms in a number of ways. Some of them put defence mechanism in 5 or 6 main categories while other extend them up to 17-18 categories. Defence Mechanisms are learned and designed to tackle self-devaluation, anxiety and hurt and operate automatically at habitual levels.

Projection is a psychological defence mechanism proposed by Anna Freud in which an individual attributes unwanted thoughts, feelings, and motives onto another person. Projection which Anna Freud also called displacement outward. It involves the tendency to see your own unacceptable desires in other people. In extreme cases a person may be convinced that others are conspiring against him and develop delusions

of persecution other reactions of projective mechanism include the individuals to others.

Example- A person who is cheating is under the impression that their partner is cheating on them.

Reaction formation which Anna Freud called "Believing the opposite" is a psychological Defence mechanisms in which a person goes beyond denial and behaves in the opposite way to which he or she thinks or facts.

Example- A woman who unconsciously is resentful of the responsibilities of child rearing overspends on expensive gifts and clothing for her children.

Regression Reverting to childlike patterns of behavior. Regression is a defence mechanism proposed by Anna Freud whereby the ego reverts to an earlier stage of development usually in response to stressful situations.

Example- A student gets a bad grade on their test and screams and cries at their parents or teaches.

Repression is an unconscious defence mechanism employed by the ego to keep disturbing or threating thoughts from becoming conscious. Anna Freud also called "motivated forgetting" is just that; not being able to recall a threatening situation, person or event.

Example- Not remembering a traumatic incident which you witnessed a crime.

Displacement occurs when the Id wants to do something of which the super ego does not permit. The ego thus finds some other way of releasing the psychic energy of the Id. Thus, there is a transfer of energy from a repressed object cathexis to a more acceptable object.

Example- Taking your anger toward your boss out on your family member or children by yelling at them and not your boss.

Sublimation is similar to displacement but takes place when we manage to displace our unacceptable emotions into behaviors which are constructive and socially acceptable, rather that destructive activities. Sublimation is one of Anna Freud's original defence mechanisms.

Example- A man who gets into fights as a teenager becomes a professional prize fighter.

Denial is a involves a refusal to accept reality thus blocking external events from awareness. If a situation is just too much to handle, the person may respond by refusing to perceive it or by denying that it exists. Many people use denial in their everyday lives to avoid dealing with painful feelings or areas of their life they don't wish to admit.

Example- An alcoholic insists that he is only a social drinker.

Most of Defence mechanisms are self-deceptive in nature. Some defence mechanisms are positive in nature and some are negative in nature. i.e., positive defence mechanisms are sublimation, rationalization, repression, undoing etc. and negative defence mechanisms are displacement, projection, regression, reaction formation etc.

Developing defence mechanisms are part of normal development and these mechanisms can be positive ways of handling difficult situations. With the right treatment people can find positive ways of dealing with uncomfortable feelings and emotions.

Taking therapy can help a person explore the thoughts and feelings that may be behind a particular defence mechanism. Therapy may involve one to one sessions or group sessions.

Stress management can help reduce the need for defence mechanisms. Some helpful techniques are

- regular exercise or physical activity
- Yoga
- Meditation
- Relaxation therapy

Meditation for an underlying mental health condition. Depending on the condition these treatments may include Antidepressants Anti- anxiety medications.

Defence mechanism are a natural part to human psychology. They help the mind to cope with uncomfortable or traumatic situations or emotions. However, some people routinely use defence mechanism as a way of avoiding their feelings and emotions or excusing their behavior this can have a negative impact on a person's mental health and relationships. With the right treatment, people can reduce their use of defence mechanisms and learn to handle their feelings and emotions in a positive way.

Teacher has to be very cautious about students' behavior, teacher could not avoid students as well as mental health and also their attitude. Teacher can suggest how to overcome with the situation. In these situation/ condition teachers and parents should be more active. Teacher should maintain good teacher-pupil relationship and help them to build up the morale.

State Aided College Teacher, Department of Education

OUR PLACEMENT INITIATIVES

The Placement Cell at Heramba Chandra College strives to facilitate job placements for students across all disciplines offered by the college. Students from Heramba Chandra College were successfully placed in the following companies during the academic session of 2021-22, as reported by the Placement Cell.

Adamas University	LG Pinnacle Enterprise
Arpy Assets Pvt. Ltd.	Novabenefits Pvt Ltd
BYJU	Ostore
Castle Liquors Pvt Ltd	Punjab National Bank
CESC	RT Network Solution
Focus Edumetics	SBI Card
Fusion	South Eastern Railway
Genpact	Sunknowledge
ICICI Pru Life	Suraksha Diagonistic
Indigo	Yavanna Soft
Kochartech	Zanini India Pvt. Ltd.

In addition to facilitating job placements, the Training and Placement Cell arranges a diverse range of seminars and workshops focused on different aspects of student development. These include sessions on career counselling, nurturing soft skills, managing expectations, gaining industry insights, honing resume writing and interview skills, cultivating personal branding and online presence, and fostering an entrepreneurial mindset and startup culture.

The She-Cession in the COVID Era

Suravi Kar Roy

"This pandemic has magnified every existing inequality in our society- like systematic racism, gender inequality, and poverty,"- Melinda Gates, American Philanthropist, former computer scientist and general manager at Microsoft.

The impacts of pandemic have never been gender neutral. Pandemics expose and exploit the pre-existing inequalities in the world, gender inequality being a significant one among them. The current COVID-19 pandemic reaffirms this trend. The pandemic recession has been designated as a "She-Cession" by some economists, as it accentuates and widens the existing gender gap implying disproportionately negative, gloomy impacts on women. It reverses the decades of progress made towards narrowing the gender gap. Some global studies demonstrate that women have been hit much harder socially and economically compared to men by COVID crisis. Important research, conducted by the Institute for Health Metrics and Evaluation at the University of Washington and published in the 'The Lancet', shows that women are experiencing greater negative socio-economic impacts than men.

The Sustainable Development Goal of the United Nations includes some important targets aimed at attaining gender equality. These goals can be summarized as ending all forms of discrimination against all females everywhere; eliminating all forms of violence against all females in the public and private spheres; eliminating all harmful practices, such as child, early and forced marriage; recognizing and valuing unpaid care and domestic work through the provision of public services, infrastructure and social protection policies; ensuring women's full and effective participation and equal opportunities for leadership at all levels of decision-making in political, economic and public life; ensuring universal access to sexual and reproductive health and reproductive rights; undertaking reforms to give women equal rights to economic resources, as well as access to ownership and control over land and other forms of property; enhancing the use of enabling technology, in particular information and communications technology; adopting and strengthening sound policies and enforceable legislation for the promotion of gender equality and the empowerment of all women and girls at all levels. The resolution on promoting gender equality has brought about progress in few areas, but the promise of a world full of gender equality for every women remains unfulfilled. It is extremely essential to analyse what impact the current pandemic has on the sustainable goals on gender equality.

The goal of eliminating all forms of violence against all females in the public and private spheres: "Women's voices in developed and developing countries continued to be silenced, amid pervasive discrimination and violence, obstacles, including conflict,

terrorism, natural disasters, and inequality of training and employment"- Munir Akram, the President of the UN Economic and Social Council. A new UN report on COVID-19 and girls and women summarizes the pandemic to cause an increase in domestic violence levels as girls and women are trapped with their abusers in crowded homes, with restricted movement and economic adversity, limited access to services, inability to call for help or escape. The lockdown has increased the reports of domestic violence by 30%. In many countries there have been reports of both physical and verbal attacks even on women healthcare workers. Support to violence services were highly constrained as organizations working against violence on women were facing challenges amid lockdown. Again, life-saving care and support services including the clinical management of rape and mental health and psycho-social support, were affected in hospitals overburdened with tremendous pressure of handling COVID-19 cases. Measures to protect women from violence must be made an integral part of government responses to the COVID pandemic and also of recovery packages, such as ensuring shelters stay open as essential services, or repurposing unutilised spaces to provide shelter to affected women and girls.

The goal of eliminating all harmful practices, such as child, early and forced marriage: "Child marriage threatens the lives, well-being and futures of girls around the world"-UNICEF. Job loss, loss of household income, prolonged school closures placed adolescent girls at an increased risk of child marriage during the Covid-19 pandemic. In 2019, one in five young women 20 to 24 years of age across the world was married as a child and with the highest figure in sub-Saharan Africa, with more than one in three young women.

The goal of Recognizing and valuing unpaid care and domestic work through the provision of public services, infrastructure and social protection policies: "Affordable, reliable childcare shouldn't be a luxury for some. It should be available to all—during COVID-19 and always." - Melinda Gates, philanthropist. COVID-19 has exposed the negative consequences of pre-existing gender gaps and norms in care-giving, demonstrating the fact that across the world, maintenance of everyday human lives is dependent on the unpaid labour of women. Before lockdown women spent three times as many hours as men on unpaid care work at home. Due to lockdown, the prolonged closure of school, day-care centres, parents, women in particular were required, to care more for children and older persons, facilitate learning of the children at home, and hence experience labour market penalties and stress. Additional burden of unpaid labour reduced time for paid work, education, and career advancement, widening inequalities further. Gender gaps in unpaid care were highest in the families where the father continued to be employed while the mother was not. The social policy response to the crisis must incorporate increase in public investments in quality childcare, education, and out-of-school supports, increasing the length, and incentivising the take up, of fathers' parental leave, to encourage father's long-term behaviour of caregiving.

The goal of ensuring women's full and effective participation and equal opportunities for leadership at all levels of decision-making in political, economic and public life: "Women are the real heroes of this crisis, even if they are not recognized as such. But curiously, there seems to be a lack of awareness that women are actually shouldering the response to this crisis. Even if they are saving lives, they remain unsung heroes," Phumzile Mlambo-Ngcuka, Executive Director of the UN Women. On

1 January 2020, representation by women in single or lower houses of national parliament reached 24.9 per cent, up marginally from 22.3 per cent in 2015. In 2019, 28 per cent of managerial positions in the world were occupied by women. Women represented 39 per cent of the world's workers and half of the world's working-age population. The United Nation's policy guide recommends that govt policy to respond to crisis must ensure women's equal representation in all COVID-19 response planning and decision-making, recognising the importance of women performing the role of the leaders and problem-solvers, acting as frontline responders, healthcare workers, and community organizers and volunteers. Govt's fiscal relief measures must ensure that women are placed at the heart of the pandemic response and recovery plans, including putting cash in women's hands and extending protections to the informal workers, supporting women organisations. Frequently policies have been taken without consulting with women or including them in decision-making. Globally,70% of executives in global health are women concentrated into lower status, lower paid or unpaid roles. Men make the decisions whereas women perform the work. COVID-19's impact on female entrepreneurship has been disproportionate, including women-owned micro-enterprises of the developing countries. The United Nation's chief Antonio Guterres in his speech remarked that "Women's equal participation is the game-changer we need".

The impact of the pandemic on employment of women: "Global employment in 2020 declined more for women, youth, and the medium and low-skilled. Women were disproportionately affected, accounting for 38.9 per cent of total employment before the COVID-19 crisis (2019) but making up 47.6 per cent of employment losses in 2020". International Labour Organisation (ILO), 2021. Pandemic affecting women and their employment opportunities, leading to the loss of job for women with majority of insecure, informal and lower-paying jobs. Globally, informal work in developing economies constitute 70 percent of women's employment which disappear first at the time of recession. Women are employed more in sectors harder-hit by Covid-19, like the hospitality industry or as domestic workers. A study on data from 193 countries using surveys taken from March 2020 to September 2021 reveals that throughout the world, rate of employment loss for women was higher than men. The accommodation, food services and manufacturing sectors, which are highly feminized, have been some of the most affected sectors in terms of job loss as per the International Labour Organization's research from 33 countries. As per a recent study (Madgavkar, White, Krishnan, Mahajan, Azcue), in India women made up 20 percent of the workforce before COVID-19; their share of job losses resulted from the industry mix alone is estimated at 17 percent, but unemployment surveys suggest that they actually account for 23 percent of overall job losses. The gendered nature of work across industries, lack of progress to resolve societal barriers, deep-rooted biases in the social system, increase of time spent by women on family responsibilities explain the gender inequality in job-loss rates. The pandemic severely affected economic activities of people at the lower rung of the occupation hierarchy, especially women, who lost jobs or were obliged to accept wage cuts. The gender gap in India experienced widening to 62.5%, largely due to women's less than adequate representation in politics, technical and leadership roles, fall in women's labour force participation rate, disrupted healthcare, low female to male literacy ratio, inequality in income.

The goal of ensuring universal access

to sexual and reproductive health and reproductive rights: "Women in particular need to keep an eye on their physical and mental health, because if we are scurrying to and fro appointments and errands, we don't have a lot of time to take care of ourselves. We need to do a better job of putting ourselves higher on our own 'to do' list." - Michelle Obama, former First Lady of the United States of America. The increase in COVID-19 cases crushed even the best-resourced health systems. With resources diverted to combat the corona virus and the COVID crisis, and people afraid of seeking general health care and worrying about financial pressures, many health systems were neglecting other health-related issues. The UN Women's rapid gender assessment surveys show that in 4 out of 10 countries in Europe and Central Asia, around half of women in need of family planning services experienced major obstacles in availing them since the starting of the pandemic. In Asia and the Pacific, similar problems emerged while visiting a doctor, accessing gynaecological and obstetric care. The devastating pandemic has increased maternal mortality and unintended pregnancies. It was essential that governments must ensure that health services should continue to operate safely and that policies should be implemented to protect the sexual and reproductive health of women and girls, and their new-borns. The fight against Covid-19 pandemic reduced access to HIV testing and an uninterrupted supply of lifesaving antiretroviral medication and adolescent girls were particularly vulnerable to these service disruptions in many countries.

The goal of enhancing the use of enabling technology, in particular information and communications technology, to promote the empowerment of women: 'Every girl deserves to take part in creating the technology that will change our world and change who runs it'-Malala Yousafzai education activist. Empowering women with mobile telephones bring faster social and economic progress. However, in the 66 countries with data for the 2016–2018 period, the rate of mobile telephone ownership among men was on average 6.8 percentage points higher than that rate among women. Rapid assessment surveys find a clear gender divide in access to technology and information, women and girls are less likely than men to own a cell phone, and they have less access to the internet connectivity. Gender divide in digital skills gets widened with higher level of skills and age. Women having less access, exposure and experience with digital technologies than men (OECD, 2019), are unable to participate equally in an increasingly digital society and are potentially disadvantaged when working remotely widening the gender pay gap.

The path towards She-Covery: The United Nations Secretary-General Antonio Guterres proposed some measures to progress towards attaining gender equality. These can be summarized as: realizing women's equal rights fully, including by repealing discriminatory laws and enacting positive measures, ensuring equal representation from company boards to parliaments, from higher education to public institutions, advancing women's economic inclusion through equal pay, targeted credit, job protection and substantial investments in the care economy and social protection, enacting an emergency response plan to address violence against women, and follow through with funding, policies, and political will, giving space to the inter-generational transition that is under way. At least 30 per cent of the total budget funds to COVID-19 response should be allotted to women's empowerment projects. Looking forward towards a phase of gender-positive recovery, designated as, the 'She-Covery', it is essential that policies should

focus on overcoming occupational segregation by gender, proactively strengthening the channel of women prepared for the emerging future jobs, encouragement to effective mid-career reskilling policies, along with managerial practices to develop sound, fair hiring and promotion methods. Equity in talent sourcing, selection, in organizational analysis and management combined with a more equitable approach to employee experience, reward and development is the need of the hour. 'The Closing the Gender Gap Accelerators' of the World Economic Forum's Centre for the New Economy and Society aims at enabling countries to advance gender equality, combining numerous strategies with the objectives like: 1. considering gender parity into the post COVID-19 world of work, reskilling women to prepare for re-employment in potential high growth sectors, 2. narrowing gender gaps in remuneration between and within sectors, in pay reviews, improvement of work quality and payment standards across currently low-paid work, 3. encouraging women's participation in the labour force, flexible work arrangements, enhancing social safety nets, on provision of childcare support, 4. bringing more women into management and leadership. These Accelerators are presently operative in over 10 economies. As economies and societies are preparing for a new post-pandemic world, it is essential that the She-Covery phase must begin with great momentum to establish gender equality and to benefit all the stakeholders in the society.

Selected references

1. The Shadow Pandemic: How the COVID-19 Crisis is Excerbating Gender Inequality, By Michelle Milford Morse and Grace Anderson, United Nations Foundation, April 2020.
2. Covid has intensified gender inequalities, global study finds: by Andrew Gregory, Health editor, The Guardian, 2nd march, 2022.
3. "Quantifying the effects of the COVID-19 pandemic on gender equality on health, social, and economic indicators: a comprehensive review of data from March, 2020, to September, 2021" by Luisa S Flor, Joseph Friedman, The Lancet, volume 399, issue 10344, p-2381-2397, June 25, 2022.
4. Gender inequality in Indian labour market, by Balwant Singh Mehta, The Pioneer, 09 March 2021.
5. The Widening Gender Gap in India: A Cause of Concern by Ratika Rana (Digital Journalist) India, The Logical Indian, 30 June 2021.
6. OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19), Caregiving in Crisis: Gender inequality in paid and unpaid work during COVID-19, OECD, Tackling Coronavirus (COVID-19) Contributing To a Global Effort, 13 December 2021.
7. How India fared in Global Gender Gap Report 2021, by Jagadish Shettigar, Pooja Misra, MINT, 7th April 2021.
8. Benchmarking Gender Gaps: Findings from the Global Gender Gap Index 2021, Insight Report, World Economic Forum, March 2021.
9. Progress towards the Sustainable Development Goals Report of the Secretary-General, United Nations, Economic and Social Council Distr. General, 28th April 2020.
10. NBER Working Paper Series- The Impact of COVID-19 on Gender Equality by Titan Alon Matthias Doepke Jane Olmstead-Rumsey Michèle Tertilt, National Bureau of Economic Research, Working Paper 26947, April 2020.

State Aided College Teacher, Department of Economics

What Does Freedom Mean to You?

Esha Kumari Shaw

Somebody had rightly said "Life without liberty is a life not lived". But What is liberty or in simple terms "Freedom"? Well I am writing this essay where I get the opportunity to express my opinion is what we call freedom of expression. As humans, we enjoy different types of freedom. 'Article 19' of our constitution talks about this. Freedom has been the greatest quest for humans all their life. There is nothing in life more valuable than freedom, obviously because nobody wants to be a slave of someone or something, people don't like to be controlled. Everybody wants to enjoy a sense of freedom in their life. We use freedom to express ourselves, do or act as whatever we like. Freedom is just like any other thing the importance of which is realised only when it is lost. Freedom is a right, in fact a privilege that we enjoy. If someday you think the freedom or the rights that you have are not enough trying asking a 'Dalit'. Since, Freedom is a subjective concept is depends entirely on a individual's point of view. According to some philosophers, people want more freedom in these areas i.e. the freedom to choose where to live, where to work, whom to marry etc. Real sense of freedom for me as a student lies in 3 things i.e. financial freedom (related to money), freedom to choose our careers (related to education) and freedom of mind (related to spirituality).

Financial: Freedom financial freedom or financial stability is one of the most important aspect of freedom for me. It is only when we are financially free or independent that we are able to make our own decisions. Being financially independent can help us lead a better life. This is something I feel is very important for the women of our society.

Freedom to choose our careers: A lot of people don't consider arts as a stream rather a time waste. We already have enough engineers who are doing everything except engineering. Hence a student should have the freedom to choose whichever stream they want without peer pressure from their parents or society.

Freedom of mind: Clinton Lee Scott said "the freedom of the mind is the beginning of all other freedom", freedom only exists when there is no confusion. Our mind is always distracted or confused it is because we have got so many options when we get freedom from something we ge trapped in another thing. Therfore, real freedom is the freedom of mind, when the mind is totally free of all the fears, anxieties, confusion, ideologies and limitations. This is when we experience freedom in real sense.

Let's not forget freedom comes with a 'responsibility'. It has been given tous because it's our birth right and not to oppress other people. Let us all use our rights to help each other and only then we can make a nation which truly understands the meaning of rights and freedom.

6th Semester, Department of Commerce

মহামারী

সোমনাথ হালদার

কে জানে! হয়তো একদিন তুমি আমিও পড়ে থাকব-
কোন ধ্বংসস্তূপের মাঝে।
হঠাৎ এক ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্যয়
ছিনিয়ে নেবে আমাদের আশা
আকাঙ্ক্ষা আর সাজানো স্বপ্নগুলোকে
শত সহস্র বছর পরে হয়ত বা কোনো একদিন।
কোন ঐতিহাসিক তাঁর দলবল নিয়ে;
চালাবে খননকার্য আগ্রহী হয়ে।
পাবে নানা নিদর্শন আমাদের এই সভ্যতার,
আর পাবে আমাদের নর কঙ্কালগুলোকে।
স্তরে স্তরে সাজানো থাকবে মূর্তির মতো,
তারা শুধু দেখবে সেই দৃশ্য,
কিন্তু কোনো কিছু অনুভব করতে পারবে না।
জানাবে না তারা তোমার-আমার সম্পর্ক,
কিংবা স্বপ্নগুলোর কথা
শুধু হিসাব মেলাতে থাকবে- এই সভ্যতা কবেকার।
মানুষের জীবনযাপন কেমন ছিল,
কোন অগ্রগতি হয়েছিলে এ সময়?
আরও হাজারো প্রশ্ন থাকবে মনে
তারপর সমস্ত অঙ্ক মেলাতে পারলেও
পারবে না আমাদের মন, আমাদের জীবন,
আমাদের আশা,
স্বপ্নগুলোকে মেলাতে।
সবথেকে বড় ট্র্যাজেডি কি জান
আমরা তাদের কাছে চিৎকার করে
বলতেও পারবো না আমাদের জীবনকথা।
শুধু মৃতের স্তুপের মাঝে নিশ্চিত নিদ্রায়-
শায়িত থাকব আমি তুমি আরও হাজারো মানুষ।
আর আমাদের একটাই পরিচয় সবার
আমরা এককালে জীবিত ছিলাম- ‘সেদিন’! আজ আর নেই।
রক্ত যাবে শুকিয়ে দেহের মাংস যাবে খসে।
শুধু হাড় কটা সম্বল করে পড়ে থাকবো-
হাজারো মানুষের সাথে
এক হয়ে মাটির নীচে অন্ধকারে।

চতুর্থ অর্ধবর্ষ, বাংলা বিভাগ

Kajalrekha Musical Foundation

The Kajalrekha Musical Foundation (KMF), established in 1998, was conceived with the idea of supporting the specially-abled and under-privileged musicians. The foundation has been established in the name of Late Smt. Kajalrekha Banerjee. Envisaged by her son, Tabla Maestro, Late Pt. Subhankar Banerjee, the foundation has strived and achieved the objective of providing financial aid, including scholarship and health insurance, to the disadvantaged section of the music fraternity for the past two decades. Annual concerts involving various stalwarts and periodical music concerts for the youngsters are organized by the foundation. Kajalrekha Musical Foundation has collaborated with Heramba Chandra College with an intention to build an atmosphere of Indian Classical Music in the institute; to develop knowledge, skill and musical performance of the students and also to organize workshop, seminar and other academic activities.

WELL DONE

Congratulations to Ayush Bhattacharjee, a student of the 2019-2022 B.Com. Honours Programme. He, despite facing the challenges of cerebral palsy, has secured a remarkable position as a Remote Admin Independent Contractor at SouthEnd Consulting Group. He has achieved an annual salary of over INR 4,00,000. We extend our heartfelt congratulations to him for this outstanding accomplishment.

করোনাকালে তাঁতিপাড়া

সাদ্দাম হোসেন মণ্ডল

তাঁতি পাড়ার লোকের ঘুম থেকে ওঠার জন্য অ্যালার্ম লাগে না । সকালের তাঁতের খট খট শব্দ তাদের ঘুম ভাঙ্গানোর জন্য যথেষ্ঠ। ভোরে ঘুম থেকে উঠে তারা যেন শত গুন শক্তি নিয়ে যে যার কাজে বেরিয়ে পড়ে। এই কয়েক মাস হল তারা যেন নেতিয়ে পড়েছে। মনের মধ্যে আর নেই কোন আনন্দ, নেই কোন কাজ করার সতস্ফুর্তি কারণ তাদের সেই প্রিয় খট খট শব্দ যে বন্ধ হয়ে গেছে। এখন তারা আর সেই ভোরের স্বাদ ও পায় না, কারণ সেই তাঁতের শব্দ না থাকার জন্য তাঁদের ঘুম ভাঙতে দেরী হয়। লকডাউনের ফলে তাঁতি পাড়ার তাঁত বোনা বন্ধ হয় গেছে কয়েক মাস যাবৎ। শত শত তাঁতি পাড়ার মানুষ এই তাঁত শিল্পের সাথে যুক্ত। বর্তমানে তারা কাজ হারিয়ে বসে আছে বাড়িতে। দেশে এক মারণ ভাইরাস আঘাত হেনেছে তারা জানে না কি ভাবে সেখান থেকে মুক্তি পাবে। আর জানবেই বা কিভাবে তাঁদের একটা তাঁত মেশিনে কিছু সমস্যা হলেই ঠিক করতে যাঁদের কাল ঘাম ছুটে যায় তারা ভাইরাস ঠিক করবে কিভাবে? সেই নিয়ে তাদের মাথাব্যাথা নেই, কিন্তু সেই ভাইরাস যে তাদের ফুসফুস এ আক্রমণের সাথে সাথে পাকস্থলী কে চরম ভাবে আক্রমণ করেছে। খিদের তাড়নায় ছট্‌ফট্‌ করতে শুরু করেছে তাঁতি পাড়া। আস্তে আস্তে সরকার লকডাউন তুলতে শুরু করেছে, বাজার খুলতে শুরু করেছে কিন্তু তাদের তাঁত বস্ত্রের চাহিদা খুব একটা বাড়ে নি। যাদের উপর এর চাহিদা নির্ভর করে তারা তো বাড়ী থেকে বের হতে ভয় পাচ্ছে। চরম সংকটে এখন তাঁত শিল্প। অন্য দিকে রেল পরিবহন বন্ধ থাকার জন্য কাঁচা মাল বাইরে থেকে কম আসছে, তা প্রায় দ্বিগুণ দাম দিয়ে কিনতে হচ্ছে। বাঁকুড়ার বেশ কয়েকটি অঞ্চলের অর্থনীতি এবং কর্মসংস্থান এই তাঁত শিল্পের উপর দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে একটা হল বিষ্ণুপুর। এখানে বালুচরী তাঁত বস্ত্র বিশ্ববিখ্যাত।

বালুচরীর জন্ম মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জের পাশাপাশি বালুচর নামক স্থানে। চেলি ও উত্তরে ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত ছিল বালুচর। জিয়াগঞ্জের বালুচর ছিল রেশমশিল্পজাত নানা প্রকার তাঁতশিল্পীদের বসতি। পাশাপাশি জিয়াগঞ্জের নিকটবর্তী বাহাদুরপুর, বেলিয়াপুকুর, রামডহর, রমনাপাড়া, রণসাগর প্রভৃতি গ্রামসমূহতে তাঁতিরা তাদের বাসস্থান গড়ে তুলেছিল। তারা তাদের রেশমের শাড়ি জিয়াগঞ্জের বালুচরে বিক্রি করতেন। বিক্রয় কেন্দ্রের নামেই শাড়ীর নাম হয় বালুচরী।

বালুচরীর জন্মকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ। মুর্শিদকুলি খাঁ ১৭০৪ সালে সুবে বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মকসুদাবাদে স্থানান্তরিত করার পর তার বেগমদের জন্য নতুন শাড়ি তৈরীর হুকুম দেন বালুচরের তাঁতশিল্পীদের। তারা যে নতুন শাড়ি সৃষ্টি করেন তাই বালুচরী নামে খ্যাত হয়।

নবাব মুর্শিদকুলি খানের উদ্যোগে সেখানে এই শিল্পের রমরমা দেখা দেয় এবং সারা অঞ্চলে এই শাড়ির নাম ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তী কালে গঙ্গার বন্যায় এই গ্রাম বিধ্বস্ত হলে শিল্পীরা আশ্রয় নেন বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে সেখানে মল্ল রাজাদের পৃষ্ঠপোষণে এই শিল্পের সমৃদ্ধি ঘটে মল্ল রাজাদের সময়ে নির্মিত টেরাকোটার মন্দির ও অন্যান্য শিল্পের প্রভাব পড়ে এই শাড়ির নকশায় স্বাধীনতার পর বেশ প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছিল এই শিল্প। স্বদেশী আন্দোলনের পর ভারতবর্ষের মানুষ দেশীয় দ্রব্য কে বেশি প্রাধান্য দিতে শুরু করেছিল যা তাঁত শিল্পের ক্ষেত্রে আশির্বাদ হয়ে এসেছিল। আস্তে আস্তে বাড়তে শুরু করেছিল বালুচরি তাঁত এর বিস্তার। ১৯৭০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে এই বিষ্ণুপুর অঞ্চলের প্রায় প্রত্যেকটা ঘরে তাঁত মেশিন ছিল এবং বিষ্ণুপুরবাসী ওতপ্রোতভাবে

তাঁত শিল্পের সাথে জড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু শুধুমাত্র যে লকডাউনের জন্য তাঁত শিল্প ক্ষতির মুখে পড়েছে তা নয়। এর শুরু ১৯৯০ দশকের থেকে। ১৯৯০ এর দশকে ভারতবর্ষে অর্থনীতিতে দেখা দিল এক চরম মন্দা। ভারত সরকার তৎকালীন অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের যুক্তিতে ভারতের অর্থনীতি কে উদারীকরণের সিদ্ধান্ত নিলেন যেটাকে বলা হয় (LPG)। এর কারণ ভারতীয় অর্থনীতিকে এই মন্দা থেকে বাঁচানো। বিশ্বের বাজারে ভারতীয় অর্থনীতিকে উন্মুক্ত করে দেওয়া হল। সমস্ত সরকারি শিল্পকে বেসরকারিকরণের পথে হাঁটলেন সরকার। দেশের অভ্যন্তরে বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণ অর্থ বিদেশি বিনিয়োগ হিসাবে ভারতীয় অর্থনীতিতে প্রবেশ করল। ফলে দেশের অভ্যন্তরে তৈরি হল বিভিন্ন রকমের যন্ত্রচালিত তাঁত। হস্তচালিত তাঁত আস্তে আস্তে যুদ্ধে হেরে যেতে শুরু করল যন্ত্রচালিত তাঁতের কাছে। কারণ যন্ত্রচালিত তাঁতে উৎপাদনের খরচ অনেক কম ছিল। কিন্তু ২০০০ সালের পর থেকে হস্তচালিত তাঁতের আরও অবনতি দেখা দিয়েছিল। তৎকালীন সময়ে তাঁত শিল্পের উপকরণ যেমন– সুতা, রং ইত্যাদির দাম প্রচুর পরিমাণ বেড়ে গেল অন্যদিকে দক্ষিণী বিভিন্ন রকমের যন্ত্রচালিত শাড়ির ও বিদেশী শাড়ির কাছে গ্রহণযোগ্যতা হারাতে শুরু করেছিল এই বালুচরি তাঁত। একদিকে অতিরিক্ত খরচার ভার বেড়ে গেল অন্যদিকে চাহিদা কমে যাওয়ার জন্য তাঁত শিল্পের মুনাফা কমতে শুরু করল। কিছু তাঁতি বাধ্য হয়ে গামছা বুনতে শুরু করল। আর কিছু তাঁতি মদনের মত জেদ নিয়ে বসে ছিল যে মরে গেলেও গামছা বুনবোনা। লেখকের সূত্র ধরে আমরা বলতে পারি; মদন যেদিন গামছা বুনবে সূর্য পশ্চিম দিকে উঠবে। কিন্তু বেশির ভাগ তাঁতি তাঁত মেশিন বিক্রি করে বিভিন্ন রকমের কাজে যোগ দিতে শুরু করল। যেমন– ফেরিওয়ালা, লটারির টিকিট বিক্রি করা, রিক্সা চালানো ইত্যাদি। আবার কিছু লোক পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে ভিন্ন রাজ্যে চলে যেতে শুরু করল। বর্তমানে এই ক্ষুদ্র কুটির শিল্প ও কৃষি ক্ষেত্রের বিকাশ ভারতীয় অর্থনীতিকে স্বনির্ভর করে তুলবে ও তার মেরুদন্ডকে আরো শক্ত করবে। কিন্তু সরকার এই সমস্ত শিল্প নিয়ে খুব একটা ভাবেন না। শুধু ভারী শিল্পের প্রতি মনোনিবেশ করাটা অর্থনীতির ক্ষেত্রে খুব একটা ভাল ইঙ্গিত নয়। বর্তমানে ভোটের রাজনীতির রমরমায় নজর পড়ে না ক্ষুদ্র শিল্প বা কৃষি ব্যবস্থায়। জনসংখ্যার পরিমাণ উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে, কিন্তু কাজের সুযোগ সেইভাবে গড়ে উঠছে না। ক্ষুদ্র কুটির শিল্প ও কৃষি ব্যবস্থাই বৃহৎ সংখ্যক মানুষের রুজি রোজগারের চাবিকাঠি। এই সমস্ত ক্ষেত্রে অবহেলা করা মানে মানুষের দুর্দশা বৃদ্ধি। উন্নয়ন থেকে যাবে শুধু কাগজে-কলমে। কিন্তু বর্তমানে চিত্রটা অন্য রকম, সারা দেশে কোন উন্নয়নমূলক কাজ নেই, উল্লেখ নেই কৃষি অগ্রগতির কথা, শিল্পের বিকাশ ঘটিয়ে দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার প্রয়াস প্রায় শূন্য। বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য চাকরির ব্যবস্থা করার পরিবর্তে আছে শুধু ধর্মের সুড়সুড়ি। প্রশ্ন উঠছে নাগরিকত্ব নিয়ে। কিন্তু মানুষ এই সব ভন্ডামি বুঝে ফেলেছে। আস্তে আস্তে সংগটিত হতে শুরু করেছে। কারণ তারা জানে না যে শিল্পে ও কৃষি ক্ষেত্রে যারা উৎপাদন করছে তাদের মধ্যে গড়ে উঠছে এক সম্পর্ক এবং সমাজে তৈরি হচ্ছে এক বন্ধন যেটাকে বলা হয় উৎপাদনী সম্পর্ক (রিলেশন অফ প্রোডাকশন)। সেই সম্পর্কে কোন সাম্প্রদায়িকতা থাকেনা, কোন ধর্ম থাকে না, থাকে শুধু মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা, দেশের প্রতি ভালোবাসা। অর্থনীতিবিদ নার্কসের মতে "একটা দেশ দারিদ্র্য কারণ তুমি নিজে দারিদ্র"। সেই রকমই একটা দেশ সাম্প্রদায়িকতার আগুনে জ্বলে পুড়ে ছারখার হচ্ছে কারণ আমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের মনের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করে রেখেছি। মানুষের মনের মধ্যে ঢুকে থাকা সেই বীজের মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলি জল দিয়ে তা অঙ্কুরোদগম হতে সাহায্য করছে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্য। ডিভাইড এন্ড রুল পলিসির মাধ্যমে মানুষকে মানুষের সঙ্গে লড়িয়ে দিয়ে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ইস্যুগুলিকে আড়াল করে দিচ্ছে যেমন, গরিবের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দাবিগুলোকে জনগণের থেকে আড়াল করে দেওয়া হচ্ছে। সরকারের এই সমস্ত ক্ষুদ্র শিল্পগুলির দিকে বেশি করে আলোকপাত করা দরকার। কৃষি ব্যাবস্থার সাথে সাথে এই শিল্পগুলির অগ্রগতি দরকার ভারতবর্ষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ

আত্মহত্যা!

পার্থিব সূত্রধর

বুঝলেন! আমি চললাম... আত্মহত্যা করতে চললাম।

শুনলেন কথাটা?

তাতে কি হাসি পেলো?

না দাদা! হাসবেন না প্লিজ্। আমি সত্যিই আত্মহত্যা করবো ঠিক করে ফেলেছি আর তাই বসেছি একখানা জবরদস্ত সুইসাইড নোট লিখতে। যে পড়বে, তারই পেট ফেটে হাখ থুরি থুরি! চোখ ফেটে জল বেড়িয়ে আসবে। গাল তো বটেই, সেই জলে জামাকাপড়ও ভিজে যেতে পারে।

চোখের জল এলে, নাকেও জল আসে। তাই চোখের জলে না হোক, এ্যট লিস্ট নাকের জলে মানে নাক ঝেড়ে, নাক মুছে যাতে আপনার, মানে পাঠকের হাতের রুমালখানা ভিজে যায়- সে ব্যবস্থা আমি করেই ছাড়বো। দেখুন না, কী হয়!

যাই হোক, আত্মহত্যা কেন করবো, কেন করতে চাইছি- সে কথা আগে বলি।

প্রসঙ্গত, আত্মহত্যা মানুষ কেন করে- তা আপনার জানা আছে তো? একথা জিজ্ঞেস করার উদ্দেশ্য হলো- যাতে আপনি আমার এই সুইসাইড নোটটিকে তাচ্ছিল্যের চোখে না দেখেন এবং এটা পড়ে কেঁদে-কেটে একেবারে রসাতলে যান। আমি যদি ইন কেস না-ও মরি- মানে কোন রকমে বেঁচে যাই আর কি, আপনি এটা পড়ে কেঁদে ভাসাবেন- এটাই আমার 'মোডাস অপারেন্তি' বলতে পারেন। কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করেন, কেন আপনাকে কাঁদাতে চাইছি, তাহলে আপাতত সেটা রহস্যই থাক।

যাই হোক, শুরু করি আমার দুঃখের আলেখ্য। বুঝলেন দাদা! আমি একজন ব্যর্থ প্রেমিক। মানুষ যত যত কারণে আত্মহত্যা করে, প্রেমে ব্যর্থতা যে তার মধ্যে এক নম্বর ক্যাটেগরী- সেটা জানেন নিশ্চয়ই।

না না! তাই বলে আমাকে ওই ফটকে চ্যাংড়া প্রেমিক ভাববেন না। এই মধ্য চল্লিশে ওসব অপরিণত কীর্তি করে লোক হাসাবার কোন উদ্দেশ্যই আমার নেই।

আসলে বলতে চাইছিলাম, আমি একজন ব্যর্থ বিশ্ব-প্রেমিক। আমার বিশ্বাস ছিল যে মহান মনীষীদের ভূতগুলো সব আমার ঘাড়ে চেপে বসে আছে আর আমার পিঠে কিল মারছে যাতে আমি মহান মহান সব কাজ করি। যেমন ঝগড়ুটে গিন্নির সাথে কারণে-অকারণে ঝগড়া করেও সেই ঝগড়ায় হেরে গিয়ে (এবং ভগবানকে এর জন্য দোষ দিয়ে) তাকে নিয়েই ঘরকন্না করা। আমি লক্ষ্মী ছেলের মতো এখনও তাই করছি। এছাড়া আমার ধারণা ছিল এই মধ্য চল্লিশে একটু-আধটু পরকীয়া-টরকীয়া না করলে সমাজে পুরুষ বলে ঠিক মান পাওয়া যায় না। বিশেষ করে পরকীয়া এখন যখন বৈধ। তাই সেই বোধে নিজের বউ আর নিজের বাড়ির মহিলাদের বাদ দিয়ে বাকি বিশ্বের সমস্ত মহিলাকে নিজেরই 'ইসে' মনে করে চেনা পরিচিত মহিলাদের উপযাচক হয়ে খুব উপকার-টুপকার করে বেড়িয়েছিলাম কিছুদিন। এর জন্যে দৌড়াদৌড়ি, টাকা খরচ- সবই হয়েছিল। কিন্তু একজনও এই মহান বিশ্বপ্রেমিকের প্রেমকে চেনেনি। উপকারের বিনিময় কেউ শুকনো ধন্যবাদ, কেউ ডেকে এক কাপ চা, আর কেউ বা হোয়াট্স-অ্যাপ, মেসেঞ্জারে ডিজিটাল ফুল পাঠিয়ে দায় সেরেছিল।

এরপর বিমানমার্গে, অর্থাৎ ইন্টারনেটে অভিযাত্রা! মানে আধুনিক পরকীয়াভিলাসীদের মোক্ষক্ষেত্র ফেসবুকে অভিযান।

হ্যাঁ, এইখানে চিড়ে ভিজেছিল। এক শ্রীমতি ক্যাটাবেরাস্ কাম খেপ্চুরিয়াস্, অর্থাৎ রূপে কুৎসিত-দর্শনা ও গুনে 'দেবা না জানন্তি' (বোধহয় বেগুনকেও লজ্জা দেওয়া গুণে গুণান্বিতা) একটু জুটছিল। আর তাতেই যখন নব সোহাগের রঙীন স্বপ্নে বিভোর হয়ে সবেমাত্র হাওয়ায় উড়তে শুরু করেছি, মাটি থেকে পা-টা সামান্য মাত্র উঠেছে- আমার ফানুস ফেটে গেল। শ্রীমতি ক্যাটাবেরাস্ দামী উপহার চেয়ে বসলেন। আমার মুরোদে তো কুললো না! তো তাতেই তিনি 'ব-য়

আ-কার, ব-য় ও-কার' সহযজ্ঞে বিশেষভাবে বিবেচিত বিশেষণের বিশেষণ দিয়ে এমন বিষ-মাল্যে আভূষিত করলেন যে তার পাশে গৌরের মালাকে বড়ই ফালতু মনে হয়েছিল। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো আবার ওদিকে ধরা পড়ে গেছিলাম প্রতিদিনের যন্ত্রণাদায়িনি আমার ঋগড়ুটে গিন্নির হাতেও। আর সেই থেকে, আজ মাসখানেক যাবৎ উনি আমাকে খুঁড়েই চলেছেন, খুঁড়েই চলেছেন! খুঁড়ে খুঁড়ে আমায় একেবারে কলকাতার রাস্তা বানিয়ে ফেলেছেন।

তাই, বড় দুঃখে, হতাশায় আমি ঠিক করেছি যে আমি আত্মহত্যা করবো। যদি ভূত হয়ে 'ভূষণ্ডীর মাঠে' গিয়ে একটা হিল্লে করা যায়!

কিন্তু একটা সমস্যায় পড়েছি। ঠিক করতে পারছি না- মরবো কিভাবে? যত যত সব পদ্ধতির কথা রোজ খবরের কাগজে পড়ে, গল্প-উপন্যাসে পড়ে আর সিনেমায় দেখে জেনেছি,- সেগুলি ট্রাই করা যাক ওয়ান বাই ওয়ান। যদি সফল হয়েও যাই- চিন্তা করবেন না। এই আলেখ্যে ঠিক লিখে জানিয়ে দেবো। আর যদি এখানেও ব্যর্থ হই তাহলে তো আর কথাই নেই...!

তিনদিন পরে আবার বসেছি- আমার কী হলো, সে কথা আপনাদের জানাতে।

আজ্ঞে না! খুবই দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমার মরা হয়নি। অর্থাৎ এই লেখা আমার ভূতের নয়, আমিই লিখছি- সজ্ঞানে, সচেতনভাবে।

এই তিন দিনে আমি অনেক পদ্ধতি ট্রাই করে দেখলাম। কিন্তু কোনটিকেই মরার পক্ষে উপযুক্ত বলে মনে হল না।

আসলে আমি খুঁজছিলাম এমন একটা পদ্ধতি যাতে মৃত্যু হবে যন্ত্রনাহীন- পেইনলেস ডেথ। কিন্তু প্রচলিত পদ্ধতিগুলো সবই বড় যন্ত্রণাদায়ক। বেঁচে থাকতে এত কষ্ট পাচ্ছি! মরার সময়, তা-ও আবার যেচে মরতে চেয়ে কিনা কষ্ট পেতে হবে? ধূর ছাই!

তা প্রথমে ভাবলাম গলায় দড়ি দেবো। কিন্তু মুশকিল হলো- আমি দড়িতে ভালো করে গিটই বাঁধতে পারি না। গিট যদি আলগা হয়ে যায়, ঝুলতে গিয়ে দড়াম করে পড়বো তো! ভীষণ লাগবে তো তাতে! হাত-পাও তো ভাঙতে পারে। বিপদ!

তাছাড়া যখন ফাঁসটা গলায় দেবো, তখন আবার লাথি মেরে টেবিলটা ফেলে দিতে হবে। দম আটকে যাবে। হাঁসফাঁস করবো। ও বাবা! মরে যাবো তো! দূর, এটা বাজে পদ্ধতি। পুরো দৃশ্যটা কল্পনা করতেই ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম।

নাঃ! এটা না। অন্য কোন পদ্ধতি। হ্যাঁ, পেয়েছি। গঙ্গায় ঝাঁপ দেবো। সোজা গিয়ে দাঁড়ালাম হাওড়া ব্রীজে। কত নীচে গঙ্গা... বাবা! তাছাড়া তলায় কত কিছু আছে! হঠাৎ মনে পড়ে গেলো 'কহো না প্যায়ার হ্যায়' ছবিতে ঋত্বিক রোশানের জলের তলায় গিয়ে পাথরে মাথা ঠুকে যাওয়ার দৃশ্যটা। শিউরে উঠলাম।

তাছাড়া আমি এমনিতেই সাঁতার জানি না। জলের তলায় গিয়ে কীরকম জল খেয়ে ফেলবো, দম বন্ধ হয়ে যাবে! উফঃ! নাঃ! এক দৌড়ে হাওড়া ব্রীজ থেকে চলে এলাম বড়বাজারের ঘিঞ্জির মধ্যে। এখানে আর যাই হোক, দম বন্ধ হয় না।

অতঃপর! সিগারেট ধরাতে গিয়ে আইডিয়া এলো- গায়ে আগুন দেবো। সিগারেটের লম্বা সুখটান দিয়ে বসলাম দৃশ্যটা কল্পনা করতে। মানসিক প্রস্তুতি নিতে হবে তো! কিন্তু একটা জ্বলন্ত ফুলকি উড়ে এসে হাতে পড়লো। আর তাতেই উফ্! কী জ্বালা করলো মাইরি! অমনি বুঝতে পারলাম- এক ফুলকিতেই যদি এতো জ্বালা করে, তাহলে পুরো গায়ে ওরে বাব্বারে! কী ভীষণ জ্বালা করবে ভেবেই ধূর! আগুনে পুড়ে মরা ক্যান্সেল।

তাহলে রইলো বাকি কী? হ্যাঁ, ট্রেন লাইনে গলা দেবো। ভাবা মাত্র হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেলাম বালিগঞ্জ স্টেশনে। এখানে চারটে প্ল্যাট্‌ফর্ম। অনেকগুলো লাইন। দুটো দক্ষিণে, দুটো উত্তরে- চারদিক থেকে ট্রেন আসছে-যাচ্ছে।

কিন্তু কী জোরে যাচ্ছে রে বাবা! মাটি থরথর করে কাঁপছে। চাকার ঘর্ষণে মাঝে মাঝে লাইন থেকে আগুনের ফুলকিও ছিট্‌কাচ্ছে। তাছাড়া ওই বিশাল ট্রেন! অতো জোরে যাচ্ছে। তলায় পড়লে তো কেটে টুকরো টুকরো হয়ে যাবো। দরকার নেই বাবা এমন মরা মরে! তার বদলে...

আর কী রইল বাকি? সহজে মরা যায় কীসে? এক বন্ধুকে ফোন করলাম। আইডিয়া পাওয়া যায় কিনা দেখা যাক। তার কলারটোন বেজে উঠলো আমি জেনেশুনে বিষ করেছি পান...

ইএস্। বিষ। বিষ খাবো। কিন্তু বিষ পাবো কোথায়? কোনো দোকানে কি বিষ বলে কিছু রাখে বিক্রি হওয়ার জন্যে? রাখে, কিন্তু সে তো ইঁদুর আরশোলা মারার বিষ। তাতে কী মানুষ মরে? আর যদি বা মরেও, খুব একটা কষ্ট পেতে হয় না তো? তাহলে ওই জিনিসই খেয়ে দেখবো নাকি?

''হ্যালো... হ্যালো। আরে কথা বল্। চুপ করে আছিস কেন? হ্যালো। শুনতে পাচ্ছিস না?...'

আমি যখন বিষের চিন্তায় বিভোর, বন্ধু তখন হ্যালো হ্যালো করে যাচ্ছে। চিন্তা থামিয়ে উত্তর দেই এবার।

“হ্যাঁ হ্যালো। হ্যাঁ। হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি।”

“তা সাড়া না দিয়ে চুপ করে ছিলি কেন?”

“ভাবছিলাম।”

“কী?”

“তোকে বলা ঠিক হবে কিনা।”

“কি ঠিক! কী কথা? এ আবার কি আদিখ্যেতা! এত ন্যাকামী মারছিস কেন?”

“না রে, ন্যাকামী নয়। একটু ইতস্তত করে বলি, বল্‌তো, বেশ পাওয়ারফুল বিষ কোনটা হবে?”

“কাকে মারবি? বৌদি কে? না বস্‌কে?”

‘নিজেকে।”

“হা হা হাঃ!”

“হাসিস না তো উল্লুকের মতো! গা জ্বলে তোর হাসি শুনলে। সিরিয়াসলি বল্‌, কোন বিষ খেলে যন্ত্রণাহীন মরা মরতে পারবো?”

“ও-ও! মরবিও, আবার কোনো মরণ-যন্ত্রণা ভোগও করবি না?”

“হ্যাঁ। অত কষ্ট-ফষ্ট করে মরতে পারবো না।”

“তা বেশ, বেশ। হম্‌হম্‌। তা মরার দরকারটাই বা কি আদৌ?”

“ও তুই বুঝবি না। তুই শুধু বল্‌ কোন্‌ বিষেতে মরতে পারি/ না সয়ে মরণ-জ্বালা?”

“ও! মরার চিন্তায় আবার ছড়াও কাটছিস দেখছি। দ্যাখ, অকারণে হেজাস না। আর কাজের সময় ডিস্টার্ব করিস না ভাট বকে।”

“এই সন্ধ্যেবেলা তোর কীসের কাজ রে?”

“পাশের পাড়ার বৌদি পটিয়েছি। তাকে নিয়ে একটু ফুচকা খেতে যাব। তাই রাস্তায় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। ও এসে পড়ল প্রায়। তুই এখন ছাড়। আর... ও হ্যাঁ। মরলে খবর দিস্‌। ফুলের তোড়া নিয়ে কাঁদতে আর কাঁধ দিতে যেতে হবে তো, তাই। ছাড়লাম, বাই।”

ব্যাটা লাইন কেটে দিল। বিষের নামও বললো না। তাহলে? ওই ইঁদুরের বিষই কিনে খাই। যে বিষে ইঁদুর মরতে পারে, সে বিষে আমিই বা মরবো না কেন? ইঁদুরের মতো ভয়ে ভয়েই তো বেঁচে আছি। এইসব ভাবতে ভাবতে পাড়ার স্টেশনারী দোকানের উদ্দেশ্যে হাটতে লাগলাম।

দোকানের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। দোকানে বেশ ভীড়। পাশেই একটা লোক ফোনে কথা বলছে। হঠাৎ কানে এলো, লোকটা জিজ্ঞেস করছে, “ঘুমের ওষুধ খেয়েছিল? কটা... এ্যাঁ? পঞ্চাশটা! ও। তাই তো... তা এখন কী অবস্থা?... আশা নেই?... ও... হম্‌খ ইস্‌খদ।

ঘুমের ওষুধ! ইয়েস্‌। পেইনলেস ডেথের সেরা দাওয়াই ঘুমের ওষুধ। ইঁদুর মারার বিষের সাথে ঘুমের ওষুধের ককটেল- উফঃ! মরে যাওয়ার এই গেমটা হেবি জমে যাবে মাইরি!

এই মনে করে, প্রবল উৎসাহে বড় এক প্যাকেট ইঁদুর মারার বিষ কিনলাম। তারপর দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে গেলাম ওষুধের দোকানের দিকে।

“পঞ্চাশটা ঘুমের ওষুধ দিন তো।”

“কোন ওষুধ?”

“যেটা হয়, সেটাই দিন না।” মুখে একথা বলতে বাধ্য হলাম কারণ অনেক চেষ্টা করেও মনেই করতে পারলাম না একটাও ঘুমের ওষুধের নাম।

“প্রেসক্রিপশন্‌টা দিন।” বলেই দোকানের লোকটা অদ্ভুত একটা চোখে তাকিয়ে রইলো আমার দিকে। আর তাতেই কিরকম যেন গলা শুকিয়ে এলো আমার।

পাশেই কাউন্টারে বসে থাকা বৃকোদর পক্ককেশ ভীম-দর্শন লোকটি ভেড়ে ভারী গলায় বলে উঠলেন, “আপনি উদয়বাবুর ছেলে না? পঞ্চাশটা ঘুমের ওষুধ চাইছেন! ব্যাপারটা কী, শুনি?”

আর শোনানোর জন্য সেখানে দাঁড়াই! কিছু না, কিছু না বলতে বলতে সোজা পিঠটান সেখান থেকে। একদমে এক দৌড়ে সোজা বাড়ি। বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে উপলব্ধি করলাম যে প্রেস্‌ক্রিপশন ছাড়া ঘুমের ওষুধের অপারেশনটা সাক্সেসফুল হবে না।

অগত্যা ইঁদুর মারার বিষই সই!

রাত বাড়ছে। একে একে সবাই শুয়ে পড়েছে বাড়ির লোকেরা। ঝগড়ুটে গিন্নিও শুয়ে পড়েছে। শুতে যাওয়ার আগে অবশ্য একটা ‘ডাক’ দিয়েছিল। খুবই ‘উত্তেজক’ ছিল সে ডাক। ওই ‘ডাকে’র মায়ায় মোহিত হয়ে অসংখ্যবার ছুটে গেছি ‘আদি খেলা-য় মগ্ন হতে, ‘আদি রসে’ সিক্ত হতে। এমনই যাদু আছে সে ডাকে যে আমি ভুলে গেছি ওর দেওয়া যন্ত্রণাগুলোর কথা।

কিন্তু আজ আমার দিন। মরে ওকে বিধবা করে ওর সাজগোজ করা, মাছ-মাংস খাওয়া বন্ধ করবো- এ আমার বহুকালের স্বপ্ন। আমার স্থির বিশ্বাস, আত্মহত্যা করতে পারলে, আমার ভূতটা হাজার ছেরাদ্দেও উদ্ধার পাবে না। আমি এখানেই থাকবো, বিশেষ করে ওর পাশে পাশে। আর ওকে উত্তক্ত করবো, ভয় দেখাবো। এটাও একটা কারণ আমার আত্মহত্যা করতে চাওয়ার।

ও যদি সাজগোজ করতে যায়- ওর সাজার জিনিস ছুড়ে ফেলে দেবো। ওর লিপস্টিক, নেল-পলিশের সম্ভারগুলো নষ্ট করার খোয়াব আমার সেই ছোট্টবেলা থেকে। তারপর ও যখন খেতে বসবে- মাছ-মাংস খেতে দেখলেই ওর থালা উল্টে দেবো। আর সবথেকে

ভয় দেখাবো যখন বাথরুমে যাবে। উফঃ! একবার ভূত হতে পারলে না! ভাবলেই শরীরের রক্ত কীরকম গরম হয়ে যায়।

যাই হোক, যে কথা বলছিলাম, আজ আমার দিন। বহু কষ্টে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য মুখে ও গলা ফুটিয়ে তুলে ওর মোহময়ী উত্তেজক ডাকের উত্তরে বললাম, ‘‘আমার কাজ আছে। এখন বিরক্ত করো না। যাও।’’

‘‘ঠিক আছে। পরে এলে আমিও দেবো না’’, বলে ও মুখ ভেঙ্গিয়ে চলে গেলো। ‘দেবো না’ শুনেই বুকের মধ্যেটা রিনরিন্ করে উঠছিল যন্ত্রণায়, কিন্তু নিজেকে স্তোত্রবাক্য দিয়ে শান্ত করলাম। বললাম, ‘‘তুই না আজ মরবি! ওসব দূর্বলতাকে প্রশ্রয় দিলে মরবি কি করে?’’

ঠিক। অতএব শান্ত হয়ে অপেক্ষা করছি রাত গভীর হওয়ার। প্ল্যানটা হল, সবাই শুয়ে পড়লে পর প্যাকেটটা খুলে বিষটা সোজা গলায় ঢেলে দিয়ে চুপ করে গিয়ে শুয়ে পড়বো। আর ঘুমের মধ্যে বিনা যন্ত্রণায়...।

চুপচাপ বসে আছি। কিন্তু চুপচাপ যেন বসে থাকতে পারছি না। প্রচন্ড উত্তেজিত বোধ করছি। দরদর করে ঘামছি পাখার তলায় বসেও। তা মুক্তির আনন্দে না মরার ভয়- ঠিক বুঝতে পারছি না অবশ্য। তবে একটু বাদে মনে হল- ভয়ই লাগছে বেশি। তাড়াতাড়ি নিজেকে দার্শনিক ভাবতে চাইলাম। অনুভব করতে চাইলাম পরলোকের ডাককে। অনুভূতি আসছে না। তাড়াতাড়ি চালালাম মান্নার গান ইউটিউবে- ‘‘ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে/ কী সঙ্গীত ভেসে আসে’’

কিন্তু প্রথম দুটো লাইন শুনেই হাত-পা কেমন অসাড় হয়ে এলো। থরথর কম্পিত হাতে চেয়ারের তলা থেকে বার করলাম প্যাকেটটা। কিন্তু সেটা ছেঁড়ার মতো আঙুলে জোর পাচ্ছি না। শেষে দাঁত দিয়ে কোণাটা কাটলাম। প্যাকেটের মুখটা ফাঁক হতেই একটা বিশ্রী ঝাঁঝালো গন্ধে নাক ঝলসে উঠলো। গন্ধেই বমি উল্টে এলো, সেটা খাবো কি! তবুও মরিয়া হয়ে প্যাকেট থেকে কিছুটা গুড়ো হাতের তালুতে ঢাললাম। তারপর... না। পুরোটা তো দূর-অস্ত, আঙ্গুলের মাথায় এক ফোঁটা নিয়ে জিভে ঠেকালাম। আর তাতেই ইস্! ওয়াক থুঃ! কী অখাদ্য! ম্যা গো! এই খেয়ে কেউ মরতে পারে? মরার বিষ বানিয়েছিস্- ঠিক আছে। কিন্তু তাই বলে খাবার তো! তার একটা টেস্ট থাকবে না! এই জন্যেই বিষ দিলেও ইঁদুরগুলো আজকাল মরে না। মরবে কি! আসলে এত অখাদ্য খেতে, যে এগুলো খায়-ই না!

কিন্তু আমার কি হবে? মুখে দেওয়া মাত্রই যা গা গুলিয়ে উঠেছিল, তাতে পুরোটা খেতে পারিনি। কিন্তু এক ফোঁটা হলেও জিবে ছুঁইয়ে-তো-ছি। তাহলে? মরে যদি যাই, তাহলে আমার বুড়ো বাপটা- যে সবসময় সব কথায় আমার দোষ ধরে, অথচ আমি ছাড়া এক পা-ও চলতে পারে না, তার কী হবে? আমার সেই হাড়ে-ঝগড়ুটে বউটা যতই ঝগড়া করুক, অত্যাচার করুক; এসব করার জন্যে ধরে তো রেখেছে সেই আমাকেই। আমি না থাকলে এসব ও কোথায় গিয়ে করবে? কে ওকে এসব করার জন্য প্রশ্রয় দিয়ে পুষে রাখবে? আর আমার ছেলেটা! আমার বাড়ির বাকি লোকগুলো? আমি মরে ভূত হয়ে সবার কাছে এলেও তো ওরা তখন আমায় ভয় পাবে। ইস্। ওদের এত কষ্ট দেবার, এত ভয় দেখানোর কী প্রয়োজন আমার?

তার বদলে বেঁচে থাকাই ভালো। পরকীয়া না-ই বা হলো, নিজেরটা তো এখনো নিজেরই আছে। তাকে দিয়ে কাজ তো চলছে কোনো ভাবে। বিশ্ব-প্রেমের ক্যাঁথায় আগুন! নিজের ঝগড়ুটেটা যখন ডাক দেয়- ডাক তো দেয়! ফেলে চলে তো যায়নি আজ অবদি। তাহলে?

অতএব মরা ক্যান্সেল! কিন্তু... একি! পেটটা গোলাচ্ছে যে! ওরে বাবা! ওই এক চিলতে বিষেই তাহলে কি? না, না- এ কিছুতেই হতে পারে না। আমি মরবো না, মরতে চাই না।

কিন্তু পেট গোলানো বাড়তেই থাকলো। সঙ্গে যোগ হলো চিন্‌চিন্ করে ব্যথা করা। সোজা ছুটলাম বাথরুমে। হড়হড় করে বমি হলো প্রথমে, তারপর শুরু হল জলের মতো পাতলা পায়খানা।

এইভাবে চলেছে কাল সারাদিন। আজ তাই বিপদ বর্ণনায় আপনাদের জানালাম- কেন আমার আত্মহত্যা করা হয়নি। আশা করি আমার এই দূঃখের বর্ণনায় আপনারা খুবই মর্মাহত হয়েছেন। চোখের জল গাল বেয়ে গড়িয়ে গিয়ে ভিজিয়ে দিয়েছে জামা-কাপড়। নাকের জলে ভিজেছে শাড়ির আঁচল, লুঙ্গি কিংবা রুমাল। যান। আর কাঁদতে হবে না। আমার শেষ হয়েছে কথা বলা। এবার উঠে গিয়ে নাক ঝেড়ে চোখ-মুখ ধুয়ে নিন। ব্যস্। তাহলেই হবে।

বিদায়।

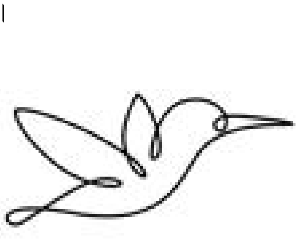

চতুর্থ অর্ধবর্ষ, বাণিজ্য বিভাগ

আর্তের সেবায় সেন্ট জন অ্যাম্বুল্যান্স

আনোয়ার হোসেন

১৯৫৬ সালের ২রা অক্টোবর বরেণ্য শিক্ষাবিদ সিটি কলেজের স্বনামধন্য রেক্টর ডঃ অরুণ কুমার সেন দক্ষিণ কলকাতার হেরম্বচন্দ্র কলেজে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় ‘‘সেন্ট জন অ্যাম্বুল্যান্স’’ নামে যে বীজ উপ্ত করেছিলেন, আজ তা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে পত্র-পল্লবে সুশোভিত এক মহীরূহের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

সেন্ট জন অ্যাম্বুল্যান্সের ইতিহাস জানতে হলে বেশ কিছুটা সময় পিছিয়ে যেতে হবে। সর্বাগ্রে বলে রাখা প্রয়োজন, সেন্ট জন অ্যাম্বুল্যান্স সম্পূর্ণভাবে একটি অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন।

বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন আর্মি মেডিকেল কোর-এর এক চিকিৎসকের চোখে পড়ল তার আশেপাশে যন্ত্রণাকাতর এমন কয়েকজন সহযোদ্ধা সৈনিক পড়ে আছেন যাদের সামান্য চিকিৎসা দিতে পারলে তাদের কারো কারো ভয়ঙ্কর রক্তক্ষরণ বন্ধ করা যেত, হয়তো তারা প্রাণে বেঁচেও যেতে পারতেন। এমনই ভাবনা থেকে জন্ম নিল ‘‘আহতের তাৎক্ষণিক প্রাথমিক চিকিৎসা’ বা ‘First Aid to the injured’-এর ভাবনা।

ইংরাজী ১৮৮৭ সালের জুন মাসে গ্রেট ব্রিটেনে এই সংগঠন প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৮৮ সালে ইংল্যান্ডের রানি ভিক্টোরিয়া এই সংগঠনে সম্মতি প্রদান করেন। ১৮৯২ সালের ২১ ডিসেম্বর সর্বপ্রথম একটি অ্যাম্বুল্যান্স ডিভিসন চালু হয় নিউজিল্যান্ডের ডুনেভিন শহরে।

১৯০৫ সালে ভারতে সর্বপ্রথম বম্বে শহরে (অধুনা মুম্বাই) পার্শী অ্যাম্বুল্যান্স অ্যান্ড নার্সিং ডিভিসন চালু হয়। ১৮১৯ সালে বুয়র যুদ্ধ এবং তৎপরবর্তী ১৯০৬ সালে জুলু বিদ্রোহের সময় জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী এই পার্শী অ্যাম্বুল্যান্স ডিভিসনের সদস্য ছিলেন। উল্লেখ্য, ভারতের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুজীও একসময় টানা চার বছর লক্ষ্ণৌ-এর প্রভিন্সিয়াল সেক্রেটারী হিসাবে সেন্ট জন অ্যাম্বুল্যান্সের সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন।

ঢেউ এসে পড়ল কলকাতাতেও। ১৯১০ সালে কলকাতার হেলথ অফিসার ডাঃ পিয়ার্সের হাত ধরে সেন্ট জন অ্যাম্বুল্যান্স ব্রিগেডের পথ চলা শুরু হয়। কলকাতা অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গকে No. II District হিসাবে ধরে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালকে কলকাতা ডিস্ট্রিক্ট-এর প্রেসিডেন্ট মনোনীত করা হল এবং সমগ্র ডিস্ট্রিক্টকে তিন ভাগে ভাগ করা হল–

১. কলকাতা পুলিশ সাব ডিস্ট্রিক্ট

২. পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ সাব ডিস্ট্রিক্ট

৩. পশ্চিমবঙ্গ ডিস্ট্রিক্ট– যার অধীনে গড়ে উঠতে লাগল ঃ অ্যাম্বুল্যান্স ডিভিসন, নার্সিং ডিভিসন, ক্যাডেট ডিভিসন এবং ক্যাডেট নার্সিং ডিভিসন। এদের মাথার উপর থাকলেন একজন ডিস্ট্রিক্ট অফিসার।

ক্রমশ দ্রুত বাড়তে লাগল একের পর এক ডিভিসন। স্কুল কলেজের উৎসাহী ছেলে-মেয়েরা সেন্ট জন অ্যাম্বুল্যান্সের অধীনে প্রশিক্ষণ নিয়ে গড়ে তুলতে লাগল অ্যাম্বুল্যান্স, নার্সিং প্রভৃতি বিভিন্ন ডিভিসন।

এখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পাঠ নিয়ে শংসাপত্র পাওয়া যায়, যেগুলি তাদের কর্মজীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বর্তমানে কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ, দমকল (Fire Brigade), সিভিল ডিফেন্স, হসপিটাল, বহু সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্মপ্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অন্যান্য সার্টিফিকেটের সাথে St. John Ambulance Brigade-এর ‘‘First Aid to the injured’’ course -এর Trained Certificate-ও বাধ্যতামূলকভাবে যোগ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। নচেৎ সেই আবেদনপত্র গ্রাহ্য হবে না।

সিটি কলেজ অ্যাম্বুল্যান্স কোর-এর অধীনে বর্তমানে চারটি কলেজ রয়েছে। কলেজ প্রিন্সিপ্যালরা সেই সব কলেজ ডিভিসনগুলির প্রেসিডেন্ট। এর মধ্যে রয়েছে– হেরম্বচন্দ্র কলেজ, প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ, উমেশচন্দ্র কলেজ এবং সিটি কলেজ অফ কমার্স অ্যান্ড

বিজিনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেসন কলেজ। একদিকে যেমন এখানে ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন Certificate Course, Voucher, Medallion, Lecturership প্রভৃতি বিশেষ প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন ও হাতে কলমে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন অত্যন্ত জরুরী জীবনদায়ী CPR (Cardio Pulmonary Ressacitation); তেমনই প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসে Brigade Annual Social Service Training Camp-এও যোগ দিচ্ছেন। তাছাড়া বিভিন্ন Public Duty তো রয়েছে। বিভিন্ন মেলায় প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে হয়। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তারকেশ্বর গাজন মেলা, গঙ্গাসাগর মেলা, পুরী রথযাত্রা মেলা। এলাহাবাদ (বর্তমানে প্রয়াগরাজ), নাসিক, হরিদ্বার প্রভৃতি জনবহুল কুম্ভমেলাতেও সিটি কলেজের প্রশিক্ষিত সদস্যরা বিশেষভাবে নজর কাড়া প্রাথমিক চিকিৎসার কাজ করে থাকেন। নাসিক কুম্ভমেলায় কঠিনতম চ্যালেঞ্জ সিটি কলেজ অ্যাম্বুল্যান্স কোর-এর ফার্স্ট-এইডাররা যে দক্ষতা এবং কঠিন পরিশ্রমের সঙ্গে সামলেছেন তার স্বীকৃতিতে উচ্ছ্বসিত মহারাষ্ট্র সেন্ট জন অ্যাম্বুল্যান্স ডিস্ট্রিক্ট-এর কমিশনার তাদের শতবার্ষিকী উৎসবে এইসব সদস্যকে বম্বেতে আমন্ত্রণ জানিয়ে পুরস্কৃত করেছেন। নিঃসন্দেহে এটি সিটি কলেজ অ্যাম্বুল্যান্স কোর-এর একটি গৌরবোজ্জ্বল দিক।

সদস্য, সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্স

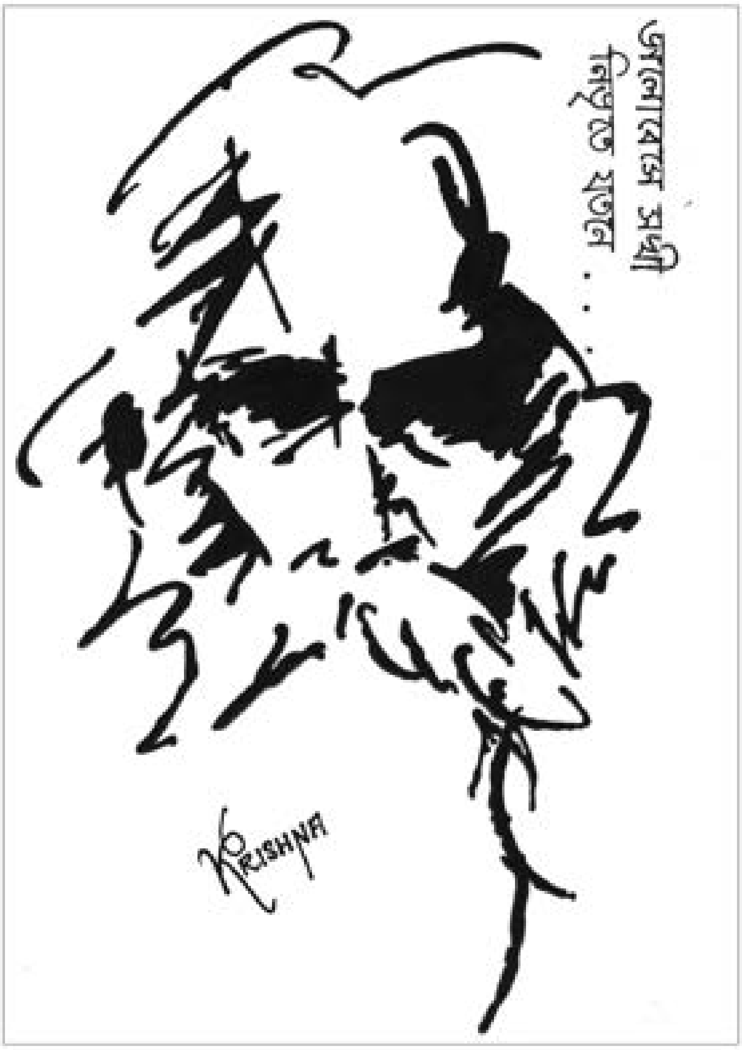

কৃষ্ণা সেন, দ্বিতীয় অর্ধবর্ষ, বাণিজ্য বিভাগ

Why Will I Study Library and Information Science?

Samhati Soor

The common concern of an undergraduate student is what to do next. Should I prefer a job option? or, Should I go for higher studies? They try to find out the answers from parents, teachers, career counsellors, subject experts, newspapers, magazines, television, websites, social networking sites etc which are in their reach. After successful completion of undergraduate study, they are usually involved in full-time/ part-time/ voluntary jobs or internship programs to gather working experience, or they engage themselves in postgraduate diploma/ degree or professional training programs, or they prepare for competitive exams, or they become self-employed. Some of them select Library and Information Science as a further career choice. It is a trial to portray a comprehensible vision to the college students on Library and Information Science as a subject of study along with its career options in present days.

What is Library and Information Science?

Library and Information Science or Library and Information Studies (in short, LIS) is an academic discipline which is interdisciplinary in nature, as it is a cross-sectional unit between two other academic disciplines i.e. Library Science or Library Studies and Information Science or Information Studies. Library Science is itself an interdisciplinary field, as it overlaps with different fields, such as, Management, Information and Communication Technology (ICT), Education, Political Economy, Statistics etc. Library Science deals with theories, principles and practices of the organization process in the libraries. The focus is given on the organization of various types of documents (systematic records of information) of the library, for example, books, journals, magazines, newspapers, manuscripts, atlases, monographs, photographs, audio-visual storage devices, e-books, e-journals etc. Information Science is also an interdisciplinary field, as it overlaps with various fields, such as, Mathematics, Logic, Linguistics, Psychology, Information and Communication Technology, Operation Research etc. Information Science deals with collection, analysis, categorization, organization, use, storage, retrieval, manipulation, dissemination, evaluation, security and re-use of information.

What will I study in Library and Information Science?

As a dynamic academic field, Library and Information Science covers a number of study areas. Such study areas are: Foundations of LIS (includes LIS Philosophy and Laws, Evolution of the field, LIS Professional Ethics, Legislative framework, Information Society,

Open Knowledge System etc), Information/ Knowledge Organization (includes subject classification procedures, mapping of universal knowledge etc), Resource Description (includes cataloging procedures, metadata standards etc), Library Administration, ICT Applications, User Study and User Education (includes Information Seeking Behaviour of the users, Information Literacy of the users etc), Information Sources, Services and Systems, Information Consolidation and Re-packaging (includes content analysis, synthesis of information, marketing of consolidated information products), Information and Communication, Management of Library and Information Centres, Library Automation, Information Retrieval and Processing, Digital Library, Preservation and Conservation of Library Materials (includes curative measure evaluation, restoration procedure of print, non-print and electronic materials, digital curation, digital preservation etc), Digital Content Management, Web Technology (includes markup language, scripting, web server, standards and protocols for online information services), Research Methodology and Statistics etc. Advanced topics like Content Management System, Informetrics and Scientometrics (includes quantitative measurements of scientific literature), Knowledge Management, Data Mining, Semantic Web, Data Analytics, Big Data Technologies etc are incorporated in the curriculum of LIS in higher educational institutions in India.

Where is Library and Information Science taught?

Presently, Library and Information Science is taught in approximately 200 universities and institutions in India. Several Central and State Universities provide different LIS courses, such as, Bachelor of Library and Information Science (B.Lib.I.Sc./ BLIS) of one year (Post Graduate Degree), Master of Library and Information Science (M.Lib.I.Sc./ MLIS) of one year (after B.Lib.I.Sc.), integrated B.Lib.I.Sc.-M.Lib.I.Sc., PhD in LIS; such universities of West Bengal are University of Calcutta, Jadavpur University, Rabindra Bharati University, Burdwan University, Kalyani University, Vidyasagar University, North Bengal University etc. Postgraduate courses of Library and Information Science give flexibility to accept the students from any stream at undergraduate level. Few more courses are available in India like Certificate Course in Library and Information Science, Post Graduate Diploma in Library Automation and Networking (PGDLAN) etc. Bengal Library Association, Kolkata has been running the certificate course since 1937. Indira Gandhi National Open University (IGNOU) offers BLIS, MLIS, PGDLAN, PhD in LIS. Documentation Research and Training Centre (DRTC), which is the iSchool of India under Computer and Communication Division of Indian Statistical Institute (ISI), provides MS and PhD in LIS. Centre for Library and Information Management of Tata Institute of Social Sciences (TISS) offers one year PG Diploma, two-year MLIS and PhD in LIS. Jadavpur University provides a two-year MLIS in Digital Library along with other existing courses. University Grants Commission (UGC) has opened the provision of opting LIS as an interdisciplinary subject at undergraduate level for the students of any stream through National Education Policy 2020.

What are my career opportunities?

The scopes are available as Library Management in Public Libraries or Academic Libraries (in Universities Libraries, Colleges Libraries, School Libraries) or Special Libraries (Government Libraries, Corporate Libraries, Medical Libraries, Law Libraries, Photo/ Film/ Radio/ Television Libraries, Libraries of News Agencies, Libraries of private organizations, Libraries in Foreign Embassies etc). Working professionals are needed in the Libraries as Library Attendant, Library Assistant, Library Clerk, Semi-Professional Assistant, Junior Professional Assistant, Senior Professional Assistant, Assistant Librarian, Deputy Librarian, Librarian/ Chief Librarian, Reference Librarian, Law Librarian, Medical Librarian, Research Librarian etc. LIS professionals may work in Information Centres or Documentation Centers as Technical Assistant, Records Manager, Documentalist, Information Analyst, Information Officer, Director/ Head of Information Centre etc. Professionals are needed to handle large-scale information in multinational companies, they are hired as Information Service Manager, Information Analyst, Information Architect, Business Researcher, Data Officer etc. Government/ Private research institutes provide the opportunities to join as Project-linked Person, Researcher, Data Administrator, Information Analyst, Information Scientist, Application Specialist etc. Professionals may join in public/ private organizations as Web Indexer, Online Cataloger, Digitization Operator, Digital Archivist, Data Curator etc as per the organizational demand in the present technological era. Now, private publishing houses offer jobs to the personnels having technical skills of LIS. However, the remuneration of LIS professionals depends upon individual qualification, experience, nature of work and the employing organization.

Is the career as a Library and Information Science Professional a good fit for me?

Information skills developed through formal education and experience are highly adaptable for Library and Information Science Professionals, because of its diverse nature and flexibility in accomplishment of technical jobs in various sectors. As they are able to preserve and catalog information, handle archives, utilize modern technology and integrate it into their field and much more, there are many different types of career options stated earlier. The careers continue to change, grow and rise due to modern online technologies and personnels need to be updated always. Networking, social media, web portals, subject gateways, integrated record management systems, institutional repositories, different information systems, online education, modern technological gadgets etc has transformed the professional activities much easier to perform, even if providing efficient services from remote. Some professionals open their own consultancy for providing their knowledge and skills on helping libraries or information centers or private organizations to work out different issues and challenges in library automation, digital archiving, use of social media, promotion and marketing of information products and many more. The career prospects are now beyond Libraries and Information Centres or Research Institutions, as information need is an obvious demand in almost all working sectors, and LIS professionals do information organization in such a way that they can deliver necessary information in the shortest period of time, thus

professionals save the time, cost and energy of the information users. Though disseminating knowledge in all levels of the society is a big challenge, Library and Information Science Professionals make it simple, functional and productive. If someone really prefers working in a proactive team, organizing information, researching hard-to-find information, using latest tools and technologies for problem solving, believing in action-based results, delivering most relevant information, strategic planning and management; a career of library and information science may be best suited.

The job satisfaction of LIS professionals depends upon employee recognition by the employing agencies, career advancement opportunities, conducive work environment, remuneration etc. like other professions. It varies from organization to organization. Though it is said that LIS job satisfaction is not that good in developing countries, it has to be noted that India-like Developing countries are now performing better in LIS professional activities with the advancement of new technologies. India has implemented National Library and Information Services Infrastructure of Scholarly Content (known as N-LIST, which is a platform to access e-books and e-journals to the colleges and universities in low cost under consortia approach), one-stop online database purchasing (known as E-Shodhsindhu), building Massive Open Online Courses (MOOCs) such as Study Webs of Active-Learning for Young Aspiring Minds (SWAYAM), National Digital Library of India (NDLI), Integrated Library Management Software (such as e-Granthalaya for government/ semi-government libraries, Software for University Libraries or SOUL), Online Union Catalog for Indian universities (known as IndCat), building reservoir of Indian Theses (known as Shodhganga), Integrated e-content Portal (known as Vidya-Mitra), Expert Database and National Researcher's Network (known as Vidwan), National Institutional Ranking Framework (NIRF) and many more. If someone is intensely dedicated, there are opportunities for self-development, organizational improvement and betterment of the society through dissemination of knowledge and information.

Librarian, Heramba Chandra College

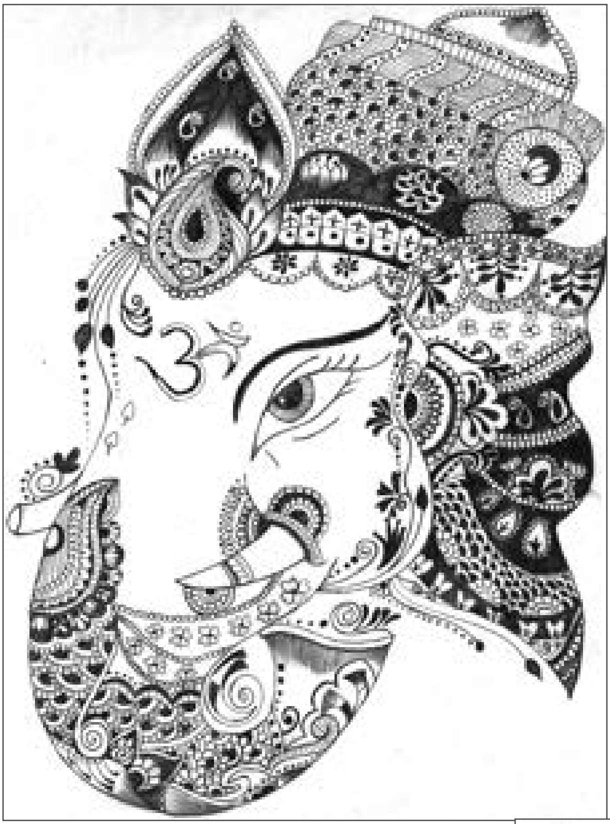

বৈশাখী দাস, ষষ্ঠ অর্ধবর্ষ, বাণিজ্য বিভাগ

বিশাল ঘোরাই, চতুর্থ অর্ধবর্ষ, বাণিজ্য বিভাগ

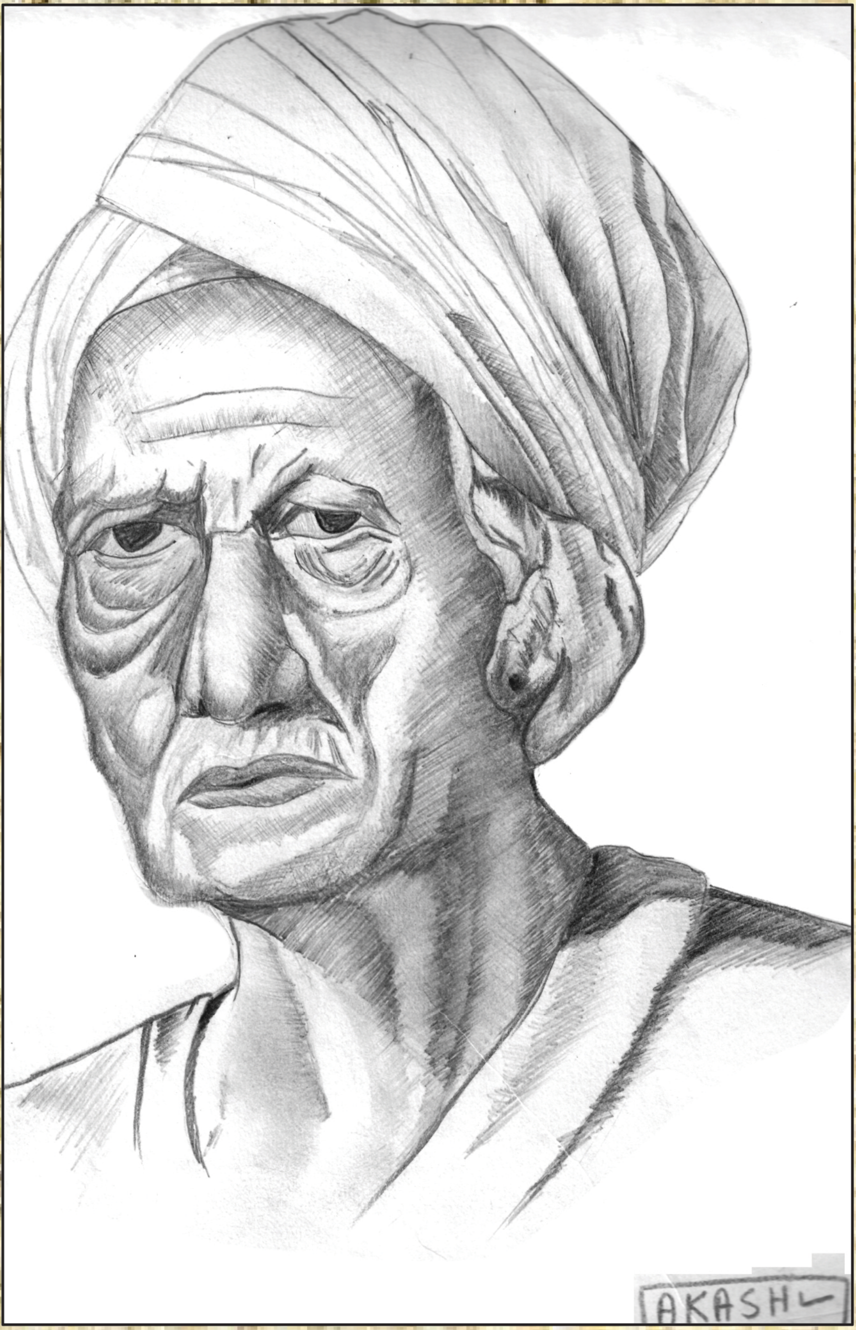

আকাশ বর্মন, ষষ্ঠ অর্ধবর্ষ, বাণিজ্য বিভাগ

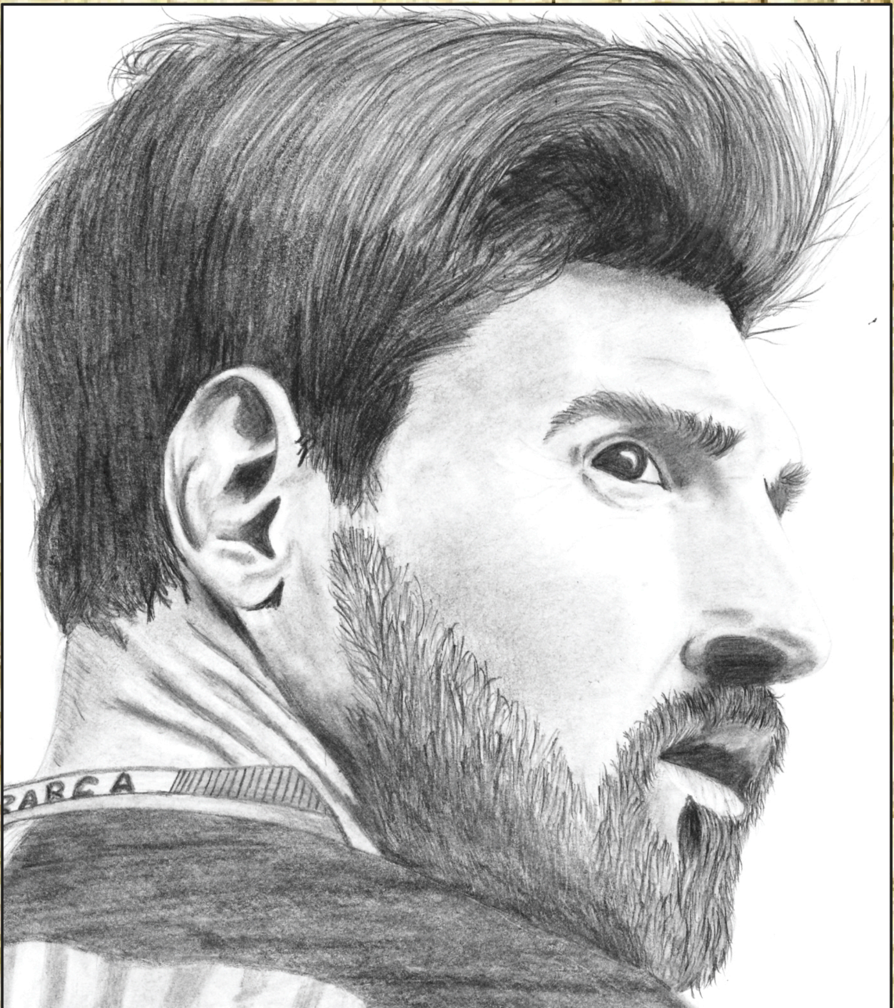

পায়েল নন্দী, ষষ্ঠ অর্ধবর্ষ, বাণিজ্য বিভাগ

হেরম্বচন্দ্র কলেজের পক্ষে অধ্যক্ষ ড. নবনীতা চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত ও এস.কে.জি. মিডিয়া কর্তৃক মুদ্রিত।